মানুষ দেবতার রহস্য সন্ধানে

অজেয় রায়

মানুক দেওতার রহস্য সন্ধানে

সে কীরে, ব্যাংকক! তপনের বন্ধুরা শুনে আঁতকে উঠল।

কেন, তাতে কী? তপন দৃঢ়স্বরে জানায়, লোকে ইউরোপ-আমেরিকায় যাচ্ছে না? পড়তে যাচ্ছে, চাকরি করতে যাচ্ছে। এ-তো ঢের কাছে। ব্যাংকক চমৎকার শহর। আর। সুনীলদা বলেছে চাকরিটাও ভালো। এক পাঞ্জাবি ব্যবসাদার ও-দেশ থেকে মশলা নিয়ে। ভারতে চালান দেয়। ওর ব্যাংকক অফিসের জন্য একজন বিশ্বাসী লোক চাই। ভালো মাইনে দেবে। অনেক বাঙালি থাকে ওখানে। সাউথ-ইস্ট-এশিয়ার সঙ্গে ভারতের কদ্দিনের যোগাযোগ জানিস?

সব শুনে বন্ধুরা ঘাড় নাড়ল, তা বটে, তা বটে। ঠিক আছে, যা দেখ কেমন লাগে। ছুটি-টুটি দেবে তো?

অত দূরে? মা খবরটা শুনে তপনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন। তপনের বাবা নেই। মা একটা স্কুলে পড়ান।

তপন বলল, কিছু দূরে নয়। তুমি ভেবো না। সুনীলদা অ্যাদ্দিন রয়েছেন।

বেশ, যা তবে। সাবধানে থাকবি। তোর বাবা থাকলেও বারণ করতেন না। খুশিই হতেন।

বি. এ. পাস করে দু-বছর ধরে চাকরি খুঁজছিল তপন। হঠাৎ বন্ধু গুরুপদর পিসতুতো দাদা সুনীল ব্যানার্জির সঙ্গে আলাপ। সুনীলদা মালয়েশিয়ায় থাকেন। সেখানে স্কুলে পড়ান। ছুটিতে কলকাতায় এসেছেন। সুনীলদা কথায় কথায় বললেন, আমার বিশেষ পরিচিত ব্যাংককের ব্যবসায়ী গোবিন্দ সিং একজন লোক খুঁজছে। যাবে ব্যাংকক? তাহলে তোমার জন্য লিখি।

তপন রাজি হয়ে গেছে।

তপনের ভাই-বোন তিলু মিলু খবরটা শুনেই লাফাতে লাগল। তিলু তক্ষুনি ম্যাপ নিয়ে বসে গেল, থাইল্যান্ডের রাজধানী, তাই না? এই তো ব্যাংকক। কীসে যাবে দাদা? প্লেন, না জাহাজে?

মিলু বলল, দাদা, ওঙ্কারভাট দেখতে যাবে না?

তপন বলল, ইচ্ছে আছে। ব্যাংককের কাছেই তো।

উঃ, কী লাক তোমার! গভীর বনের মধ্যে বিরাট ধ্বংসাবশেষ নগর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির। আমি বইয়ে ছবি দেখেছি। প্রায় হাজার বছর আগে হিন্দু-রাজত্ব ছিল ওখানে। আর জানো দাদা, ওদেশের বাটিকের কাজ খুব সুন্দর। ছুটিতে আসার সময়–আমার জন্যে একটা...

বাইরে বেপরোয়া ভাব দেখালেও প্রথমটা ভিতরে ভিতরে বেশ ঘাবড়াচ্ছিল তপন। কলকাতার বাইরে বড় একটা যায়নি সে। দিনে দিনে মনটা তার অস্থির হয়ে ওঠে। ভ্রমণ কাহিনি বা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প পড়তে পড়তে মনে মনে বইয়ের চরিত্রদের পাশে নিজেকে কল্পনা করেছে। ওইসব অজানা দেশে বিচিত্র সব ঘটনার মধ্যে নিজেও যেন জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সেই কল্পনার জগৎ যে খানিকটা বাস্তবে ফলে যেতে পারে তা কোনো আশা করেনি। এই কলকাতা, এই ভবানীপুরের এত দিনের জীবন ছেড়ে কোথায় যেতে হবে?

মনে সে সাহস আনে। কেন, এই তো সুনীলদা গিয়েছেন? বাবা নাকি পাস করেই বর্মায় গিয়েছিলেন চাকরি নিয়ে। চার বছর ছিলেন। ওঁরা শহরের লোক ছিলেন না। আর সে খাস কলকাতায় মানুষ। কত বেশি জানে-শোনে। তার অত ভয় কী?

ভালো মাইনে। বাড়িতে বেশ কিছু টাকা পাঠানো যাবে। সে কী কম আনন্দের কথা? তাতেই সব কষ্ট সয়ে যাবে।

মাসখানেকের ভিতর গোবিন্দ সিং-এর চিঠি এল। চাকরি মঞ্জুর। তপনের পাসপোর্ট ভিসা ইত্যাদি হয়ে গেল। সিং ব্রাদার্সের কলকাতায় বড়বাজারের অফিস থেকে তপনকে দেওয়া হল ব্যাংকক যাবার একখানি প্লেনের টিকিট। যাওয়ার দিনও এসে পড়ল।

মায়ের চোখ ছলছল। বন্ধুরা ঘটা করে একটা বিদায় সংবর্ধনা দিয়ে ফেলল তপনকে। তারপর সত্যি একদিন তপন রওনা দিল দমদম থেকে ব্যাংককের পথে।

.

ব্যাংকক। থাইল্যান্ড বা শ্যামদেশের রাজধানী।

তপন এক মাস হল ব্যাংককে এসে কাজে যোগ দিয়েছে।

সিং ব্রাদার্সের মালিক গোবিন্দ সিং-এর বয়স প্রায় ষাট। শক্ত সমর্থ সর্দারজি। বহু দেশে ঘুরেছেন, অনেকগুলো ভাষা জানেন, দিলদরিয়া লোক। তপনের সঙ্গে কথা বলেন ইংরেজি বা হিন্দিতে। মেনাম নদীর কাছে রাজাবংশী রোডে সিং ব্রাদার্সের মস্ত গুদাম। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অগুনতি ছোট-বড় দ্বীপ। অনেক দ্বীপেই নানারকম মশলার গাছ জন্মায়। তাই ইউরোপীয়ানরা এইসব দ্বীপকে বলত স্পাইস-আইল্যান্ডস। সিং ব্রাদার্স এই অঞ্চলের নানা জায়গা থেকে লবঙ্গ, গোলমরিচ, জায়ফল, এলাচ ইত্যাদি আমদানি করে। বড় বড় নৌকো আর লঞ্চে করে নদীপথে ব্যাংককে আনে। সেগুলো জমা হয় গুদামে,

তারপর চালান যায় ভারতবর্ষে। আবার ভারত থেকে সিং ব্রাদার্স আনে রেশম ও চা। মালের হিসেব রাখা, নদীর ঘাট থেকে জিনিস ছাড়িয়ে আনা। সব কাজই করতে হয় তপনকে। এসব ব্যাপারে তার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তবে মন দিয়ে শেখে, মশলার রকমফের চেনে।

গোবিন্দ সিং থাকেন নিউ রোডে। গুদাম থেকে বেশি দূরে নয়। তপনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে মহারাজ রোডে, গোবিন্দ সিং-এর বাড়ির কাছেই। খায় একটা পাঞ্জাবি হোটেলে–ভাত রুটি সবজি ডাল তরকারি। দইও মেলে।

তপন সপ্তাহে একখানা চিঠি দেয় বাড়িতে। মাকে লেখে–কিছু ভেবো না। দিব্যি আছি। তিলু মিলুকে লেখে ওই দেশের খবর–

ব্যাংকক বিরাট শহর, মেনাম নদীর দু-ধারে ছড়ানো। পুব পাশেই শহর বেশি জমজমাট। নদী থেকে অনেকগুলো খাল বেরিয়ে ঢুকে গেছে শহরের ভিতর। খালগুলোর ওপর দিয়ে অজস্র সাঁকো। থাইরা খালকে বলে কেলাং। বইয়ে পড়েছিস তো, ইটালির ভেনিস শহরে যেমন খাল আছে তেমনি। এই খালগুলোকে রাস্তাও বলা চলে, কারণ তাহই দিয়ে চলে অসংখ্য ছোট ছোট নৌকো, লোজন জিনিসপত্র নিয়ে। নৌকোর ওপর রীতিমতো বাজার বসে। নাম দিয়েছে–ফ্লোটিং মার্কেট। মাসখানেকে এত বড় শহরের কতটুকুই বা দেখেছি।

কলকাতার মতোই এর কোনো অংশে আধুনিক বাড়িঘর হোটেল, চওড়া ঝকঝকে রাস্তা, আবার কোনো কোনো অংশে গলিঘুঁজি বস্তি, পুরনো নোংরা ঘুপচি বাড়ি, দোকানপাট। মেনাম নদীতে নৌকো, বজরা, স্টিমার গিজগিজ করে। শ্যাম উপসাগরে পড়েছে মেনাম। বড় জাহাজ মোহনার বেশি ঢুকতে পারে না।

এদেশে বেশিরভাগ লোকই বৌদ্ধ। সাত-আটশো বছর আগে এখানে ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার বিস্তার হয়েছিল। তাই শহরে ছড়িয়ে আছে এই দুই ধর্মের নিদর্শন। পথের ধারে কত যে বৌদ্ধ মন্দির বা ওয়াট। ঢালু ছাদ, ছুঁচালো মাথা, প্যাগোডা চেহারার মন্দিরগুলি। মন্দিরের গায়ে কেবল বুদ্ধমূর্তি–নানান আকার, নানান ছাঁদ দেখে দেখে একঘেয়ে লাগছে।

পথের নাম দেখে ভারি মজা লাগে। মহারাজ রোড, রাম এক, রাম দুই, এমনি সব নাম। আগে এখানকার রাজাদের নাম ছিল নাকি রাম দিয়ে। প্রাচীন রাজধানীর নাম অযোধ্যা। ঘুরতে ফিরতে বিদেশ বলে মনে হয় না।

কত দেশের লোকের বাস। বিদেশিদের মধ্যে চিনারাই সবচেয়ে বেশি। বেশিরভাগ লোক বাইরে প্যান্ট-শার্ট পরে। তাছাড়া পাজামা লুঙ্গি কুর্তা এমনকি ধুতি-পরা লোকও দেখেছি। পথেঘাটে ঘঘারে প্রচুর হলুদ আলখাল্লা-পরা পুরুষ। এরা নাকি শ্রমণ অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। শুনেছি প্রত্যেক বৌদ্ধ থাই অন্তত কিছু দিনের জন্য সন্ন্যাস নেয়, শ্রমণ হয়।

থাইরা বেশ আমুদে। চিনা প্যাটার্নের চেহারা। জানিস, এ-দেশের টাকার নাম ভাট। প্রায় চল্লিশ পয়সার সমান এক ভাট।

শান্ত ভদ্র তপনকে গোবিন্দ সিং-এর পছন্দ হয়েছে। গোবিন্দ সিং-এর সঙ্গে থাকেন তার। স্ত্রী এবং ছোট ছেলে। ছেলের বয়স বছর পঁচিশ। বাবার ব্যবসা দেখে। বড় ছেলে গেছে। কানাডা, কাগজ তৈরি শিখতে। ফিরে এসে এখানে কাগজের কল বানাবে।

সময় পেলে গোবিন্দ সিং গল্প করেন। তিনি তপনকে কখনো ডাকেন তপনবাবু, কখনো শুধু বাবু। বলেন, কত দেশ দেখলাম, কত কী শিখলাম, বড় ছেলে ফিরে এলে আমার ছুটি। আর দু-তিন বছর। তারপর দেশে চলে যাব, লুধিয়ানা। খেত-খামার করব। তখন ইচ্ছে হলে তুমি চলে যেও আমার কলকাতার অফিসে। ওখানে ভালো লোক দরকার।

তিলু মিলুকে লিখল তপন–

কয়েকটা নামকরা বৌদ্ধমন্দির দেখে ফেলেছি। যেমন ওয়াট পো, ওয়াট অরুণ ওয়াট ফ্রা-কিও। ফ্রা-কিওতে আছে বিখ্যাত এমারেল্ড বুদ্ধ। মন্দিরগুলোয় বিষ্ণু, গরুড়, কিন্নর, ড্রাগন ইত্যাদির মূর্তি। বড় বড় মন্দির সোনা আর মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি। আর দেখেছি রাজপ্রাসাদ ও মিউজিয়াম। একটা ছুটির দিনে প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যা দেখতে যাব। ঘোরার সময় তেমন পাই না। এত রাস্তা, ভয় হয় পথ না হারাই। পকেটে ব্যাংককের

একটা ম্যাপ রাখি। হ্যাঁ, মিল ঠিক বলেছিলি, এখানে কাপড়ের ওপর বাটিকের কাজ চমৎকার। থাইরা ঘরে ঘরে বাটিক করে। নিয়ে যাব তোর জন্যে।

এই অযোধ্যা দেখতে গিয়েই এক রবিবার তপনের সঙ্গে আলাপ হল ডক্টর ইন্দ দত্তর, ফলে তার জীবনে আর একটা চমকপ্রদ মোড় ফিরল।

ব্যাংককের উত্তরে অযোধ্যা। সকালে ট্রেনে চড়ে রওনা দিল তপন। ঘণ্টা দুই লাগল পৌঁছতে। মেনাম নদীর ভিতর কয়েকটি দ্বীপ এবং নদীর দুই তীরে ছড়িয়ে আছে এই রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। প্রায় দুশো বছর আগে বর্মীদের আক্রমণে এই নগর ধ্বংস হয়।

তপন ঘুরে ঘুরে দেখছিল। আরও অনেক টুরিস্ট এসেছিল। একটি লোককে তার বিশেষ ভাবে নজরে পড়ল।

ভদ্রলোক অন্তত ছ-ফুট লম্বা। শক্ত গড়ন, ফর্সা রং, সুশ্রী ধারাল মুখ। জুলপি ও রগের চুলে সামান্য পাক ধরেছে। পরনে ট্রাউজার্স ও ফুলশার্ট, মাথায় সাদা পানামা টুপি।

ভদ্রলোক মোটেই পুরনো মন্দির বা প্রাসাদ দেখছিলেন না। দূরবিন চোখে লাগিয়ে গাছে গাছে পাখি দেখে বেড়াচ্ছিলেন। চারপাশের লোকজন সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপ নেই।

তপনের কৌতূহল হয়। সে ভদ্রলোকের পিছু পিছু ঘুরতে থাকে। এইরকম দূরবিন দিয়ে পাখি দেখার ব্যাপারটায় তার আগ্রহ ছিল। তার এক মামার ছিল এই শখ। উনি আসামে। থাকেন। একবার কলকাতায় এসে তপনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ঢাকুরিয়ায় পাখি। দেখতে। ইনিও বোধহয় পক্ষিবিদ।

জায়গাটা নিরালা। ভদ্রলোক চোখ থেকে দূরবিন নামিয়ে ফিরলেন। তপন হাত কুড়ি পিছনে। তপনকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত দেখে তিনি পরিষ্কার বাংলায় বললেন, বাঙালি?

তপন চমকে থতমত খেয়ে ঘাড় নাড়ল।

বেড়াতে এসেছেন?

না। মানে আমি ব্যাংককে থাকি, জবাব দিল তপন।

ও! কী করেন?

চাকরি।

হুঁ। ঠিক চিনেছি বাঙালি। ভদ্রলোক হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।

কী করে বুঝলেন? খানিকটা চেহারায়, আর খানিকটা কথা শুনে। তখন নিজের মনে বিড়বিড় করছিলেন যে বাংলায়।

আপনিও কি বাঙালি? তপন জিজ্ঞেস করল।

না, তা ঠিক নয়। আমি থাই, বলেই ভদ্রলোক হো-হো করে হেসে উঠলেন।

মানে! তপন ভ্যাবাচ্যাকা খায়।

মানে জন্মসূত্রে বাঙালি বটে কিন্তু এই দেশের নাগরিক, এই দেশেই মানুষ হয়েছি। আমার নাম ইন্দ্র দত্ত।

আমি তপন রায়। কলকাতায় থাকতাম।

পাখির শখ আছে নাকি?

নাঃ, তেমন কিছু নয়। আপনাকে দেখেই বেশি কৌতূহল হচ্ছিল।

কফি চলবে?

ভদ্রলোক কাঁধে ঝোলানো কফির ফ্লাস্ক নামিয়ে ঘাসে বসলেন। তপন বসল পাশে। একটু একটু করে আলাপ জমে উঠল।

ডক্টর ইন্দ্র দত্ত ব্যাংকক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিতত্ত্বের অধ্যাপক। এই দেশেই জন্মেছেন। এদেশেই পড়াশোনা। অবশ্য ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সেও পড়েছেন কিছুকাল। বাবা বিষ্ণু দত্ত ছিলেন ডাক্তার। কলকাতায় থাকতেন। ভারতের স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ফলে ইংরেজ সরকারের বিষনজরে পড়েন। জেল খাটা এড়াতে তিনি ভারত ছেড়ে পালান। বর্মা ঘুরে আসেন শ্যামদেশে। ব্যাংককে বাস করতে থাকেন। ডক্টর ইন্দ্র দত্তর মা ছিলেন কা-প্রবাসী বাঙালি। ভদ্রলোকের বাংলা উচ্চারণ একটু বাঁকা বাঁকা। এদেশে মানুষ হয়েও বাংলা চর্চা করেছেন এই আশ্চর্য।

ইন্দ্র দত্ত দিলখোলা মানুষ। তপনের সব খবর নিলেন। চট করে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এলেন–তোমাকে আবার আপনি বলব কী হে।

কথায় কথায় ডক্টর দত্ত বললেন, আমার বাবা বিদেশে থেকে গেলেও মনেপ্রাণে ছিলেন ভারতীয়। পুরো বাঙালি। বাংলা বই আনতেন, বাংলায় কথা বলতেন ঘরে। বাবার মনে বড় দুঃখ ছিল ভারতবর্ষ পরাধীন। তাই যেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এদেশে এলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন নিয়ে বাবা একেবারে মেতে উঠলেন। কোন্ সাল হবে সেটা?

বোধহয় ১৯৪৩। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে। আমিও যোগ দিয়েছিলাম নেতাজির বাল-সেনায়। তখন আমার সাত-আট বছর বয়স।

ভারত স্বাধীন হবার পর বাবা দুবার ওদেশে যান। আমি গেছি সঙ্গে। কলকাতায় আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন থাকে। তবে যোগাযোগ তেমন নেই। বড় হয়ে আমি তিনবার ইন্ডিয়ায়। গেছি। সুন্দরবন আর জলদাপাড়া রিজার্ভ-ফরেস্ট দেখে এসেছি। বাংলাটা প্রায় ভুলেই গেছিলাম। আমার স্ত্রীর কল্যাণে ফের চর্চা। ও কলকাতার মেয়ে। কেমব্রিজে পড়তে গেছিল। সেখানেই আমাদের আলাপ, তারপর বিয়ে। চলো আজই তোমাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব। মণিকা ভীষণ খুশি হবে দেশের ছেলে দেখলে।

দুপুরে ইন্দ্র দত্তর সঙ্গে ব্যাংককে ফিরল তপন।

ডক্টর ইন্দ্র দত্তর সঙ্গে আলাপ হয়ে তপন বিদেশে একা থাকার দুঃখ অনেকখানি ভলে গেল। ব্যাংককে আরও কয়েকজন বাঙালির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল বটে, তবে এমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি।

ডক্টর দত্তর স্ত্রীও খুব ভালো। ভারি গোপ্লে। ওঁরা থাকেন সাদার্ন রোডে। নিজেদের বাড়ি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এলাকা। একতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি, সামনে টকরো জমিতে ফুলের বাগান। তপন সপ্তাহে দু-তিনবার সাইকেলে চেপে হাজির হতে লাগল ডক্টর দত্তর বাড়ি। ওকে বাড়ির ছেলের মতনই আপন করে নিয়েছিলেন তারা। ডক্টর দত্তর ছেলেঙ্গলে

নেহা একটি থাই ছেলেকে দত্তক নিয়েছেন। তার বয়স বছর পাঁচ-ছয়। ফুটফুটে দেন। নাম রেখেছেন রবি।

ডক্টর দত্ত সন্ধের সময় সাধারণত বাড়িতেই থাকতেন। তপনের সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প করতেন–তার নানা দেশের অভিজ্ঞতা, নানান জীবজন্তুর কথা। কত জায়গায় ঘুরেছেন যে ঠিক নেই। জীবজন্তু সম্বন্ধে তপনের আগ্রহ ছিল। ডক্টর দত্তর সঙ্গে আলাপ হয়ে তার নতুন করে চোখ ফোটে। ডক্টর দত্তর কাছ থেকে সে জীবজন্তু ও ভ্রমণ কাহিনির বই নিত পড়তে।

ইন্দ্র দত্তকে প্রথমে তপন ডক্টর দত্ত বলে ডাকত। ওঁর স্ত্রী আপত্তি জানালেন, তা হবে না। আমায় যখন বউদি বলেছ, ওকেও দাদা বলতে হবে।

অতএব ডক্টর দত্তকে তপন দত্তদা বলে ডাকতে শুরু করল।

চার মাস কেটেছে। গোবিন্দ সিং একদিন বললেন, তপনবাবু, আমার এক বন্ধুলোক ব্যাংককে বেড়াতে আসছে। ওর জন্য একটা কিউরিও কিনে এনে দিও। এই আট ডলারের মধ্যে। তোমার পছন্দ ভালো।

রাজাবংশী রোডের গায়ে একটা রাস্তায় অনেকগুলো কিউরিও-শপ দেখেছিল তপন। বিকেলে সেখানে গেল।

সরু গলিতে ছোট্ট দোকান। কাঁচের দরজা। ভিতরে কতরকম জিনিস সাজানো। নীলাভ আলোয় রহস্যময় লাগছে। দোকানদার কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এটা কিউরিও-শপ। অর্থাৎ দুর্লভ জিনিসের দোকান। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল তপন।

কাউন্টারে একটি মুখ আবির্ভূত হল। শুকনো হর্তুকির মতো মুখখানা। অজস্র ভাজ। তর্পনের দিকে চেয়ে হাসল সে। চোখ সরু হয়ে গেল। খুদে খুদে দাঁতের মাঝে একটি সোনা-বাঁধানো দাঁত ঝিলিক দিল।

বৃদ্ধাটিকে মনে হল চিনা রমণী। চুল টান করে ঘাড়ের কাছে গিট দেওয়া। গায়ে নীল রঙের ঢোলা জামা ও পাজামা। একগাল হেসে সে দোকানের শো-কেসের দিকে আঙল। দেখিয়ে বলল–সী।

তপন এ ধরনের দোকানে কখনো ঢোকেনি আগে। কত অদ্ভুত অদ্ভুত যে জিনিস, কতরকম মূর্তি, ছুরি, পাত্র, ছবি।

হঠাৎ একটা শো-কেসের ওপর তার চোখ আটকে গেল। সেখানে কয়েকটা পাখি সাজানো রয়েছে। জ্যান্ত নয়, স্টাফ করা। যেমন মিউজিয়ামে থাকে। তপন শুনেছে, গোটা পাখির পালকসুন্ধু চামড়ার মধ্যে কাঠের গুঁড়ো পুরে সেলাই করে দেওয়া হয়। দেখতে মনে হয় স্বাভাবিক পাখি। স্থির অবস্থায় বসা বা দাঁড়ানো।

শো-কেসের ওপর রয়েছে একটা বাজপাখি, একটা মস্ত কালো কাকাতুয়া, আর একটা অদ্ভুত দেখতে পাখি। কোনো পাখির পালকের এমন বাহার তপন কখনো দেখেনি, কল্পনাও করেনি। একখণ্ড কাঠের ওপর স্ট্যান্ড দিয়ে আটকে দাঁড় করানো রয়েছে পাখিটা। উঃ কী রং! গাঢ় লাল, কমলা, নীল, সবুজ, সাদা, কালো–রেশমের মতো নরম চকচকে পালকে আলো ঠিকরোচ্ছে। লাল আর নীল রঙের পালকই বেশি।

পাখিটা ছোট। সাত-আট ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়। খাটো ল্যাজ। সবচাইতে সুন্দর হচ্ছে তার ল্যাজ থেকে বেরনো দুটি লম্বা পালক। ঠিক যেন দুটি সরু লোহার তার লম্বা হয়ে ডগায় গিয়ে পাকিয়ে গেছে। আর তারের ডগায় সবুজ পালকের গুচ্ছ। ছোট মাথাটি উঁচু করা, ডানা ছড়ানো, যেন এখুনি উড়বে। চোখের মণির জায়গায় দুটি টুকটুকে লাল পুঁতি বসানো। বাঃ! ওই পাখি যখন উড়ে বেড়াত! তপন কল্পনা করে। ঠিক একটুকরো রামধনু যদি উড়ে বেড়ায় তেমনি দেখতে লাগত নিশ্চয়ই।

সেয়ানা দোকানি তপনের দৃষ্টি অনুসরণ করে অমনি পাখিটাকে নামিয়ে এনে সামনে রেখে বলল, বুরং রাজা।

তপন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। তখন দোকানি বদ্ধা আধো আধো ইংরেজিতে বলল, প্যারাদাইজ বার্ড।

ও, এই হচ্ছে বার্ড অফ প্যারাডাইস! এ পাখির কথা পড়েছিল তপন। শুধু নিউগিনি অস্ট্রেলিয়ায় নাকি এই পাখি মেলে। পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর পাখি। এ পাখিটায় কিন্তু বেশ খুত আছে। দূর থেকে বোঝা যায় না এমনভাবে রেখেছিল। পাখির একটা ডানার পালন প্রায় উঠে গেছে, আর একটি পায়ের আধখানা কাটা।

হঠাৎ তপনের মাথায় এল এটা দত্তদাকে প্রেজেন্ট করলে কেমন হয়? ওর বাড়িতে এমনি স্টাফ করা একটা কাঠঠোকরা পাখি আছে। এটা পেলে উনি খুশি হবেন নিশ্চয়। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে দরদস্তুর শুরু হল।

কত দাম?

বুড়ি মাথা নেড়ে, দাঁতের ঝিলিক দেখিয়ে দু-হাতের দশ দশ আঙুল ছড়িয়ে জানান– টুয়েন্টি ডলার।

বাপরে থাক, অত পয়সা নেই। তাছাড়া অনেক খুঁত রয়েছে।

অমনি দাম নেমে এল–ফিফটিন।

নাঃ।

কত দেবে?

টেন।

থার্টিন।

নো নো টেন। তপন মাথা নাড়ল।

বুড়ি মিটিমিটি করে দেখল খানিক। বুঝল তপন আর উঠবে না কিছুতেই। সে একটু হতাশভাবে বলল, অলরাইট, তে।

তপন হিসেব করে দাম দিল ভাট-এ।

দোকানি বুড়ি স্ট্যান্ড থেকে পাখিটা খুলে তার পাখা মুড়ে ছোট্ট করে ফেলল। তারপর প্লাস্টিকের থলিতে পুরে বেঁধে দিল। স্ট্যান্ডটা আলাদা দিল। আবার ইচ্ছেমতো এটাকে সাজিয়ে রাখা যাবে।

গোবিন্দ সিং-এর বন্ধুর জন্য তপন নিল একটা কাগজ-কাটার ছুরি–পিতলের হাতলে রঙচঙে পাথর বসানো।

.

০২.

সেই দিনই সন্ধ্যায় সে পাখিটাকে নিয়ে হাজির হল দত্তদার বাড়ি।

দত্তদা, আপনি বসে বসে বই পড়ুন, একটু পরে আপনাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি।

তপনের কথা শুনে দত্তদা একটু অবাক হয়ে বললেন, কী জিনিস?

দেখবেন-দেখবেন।

তপন দত্তদার দিকে পিছন ফিরে টেবিলের ওপর পাখিটা ফিট করতে থাকে।

দেখুন দত্তদা, ডাকল তপন।

বাঃ,, দত্তদা উৎফুল্ল, কোথায় পেলে? এ যে বার্ড অফ প্যারাডাইস!

কিনলাম।

কোত্থেকে?

রাজাবংশী রোডের গায়ে গলিতে, এক বুড়ির দোকান থেকে।

ও বুঝেছি। পা ইংএর দোকান।

এটা আপনাকে প্রেজেন্ট করব।

বল কী হে! থ্যাঙ্ক ইউ ভাই। কিন্তু কত নিল?

দশ ডলার।

যাক, তবু ভালো। খুব সস্তায় পেয়েছ। এখন তো নিউগিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে এ পাখির চালান নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তবে লুকিয়ে চুরিয়ে যে হয় দেখতেই পাচ্ছি।

নিষিদ্ধ কেন?

সাফ হয়ে যাচ্ছিল। হাজার হাজার জীবন্ত বা মৃত পাখি চালান হয়ে যাচ্ছিল বাইরে। অপর্ব পালকের সৌন্দর্যই এদের কাল হয়েছে। পৃথিবীর নানা দেশের লোক এদের রঙচঙে পালক মুকুটে পরে, পাগড়িতে পরে, মেয়েদের পোশাকের শোভা বাড়ায়। ভীষণ

চাহিদা। এখন শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে বা চিড়িয়াখানার জন্য বিশেষ অনুমতি নিয়ে এই পাখি ধরা বা মারা চলে। ওখানকার আদিবাসীরা অবশ্য এখনো প্যারাডাইস বার্ড বিনা অনমতিতেই শিকার করতে পারে। তাদের পালক লাগিয়ে সাজগোজ করে। কিন্তু বাইরের লোককে পাখি বা পালক বিক্রি করা নিষেধ।

তপন বলল, জানেন দত্তদা, দোকানি বুড়ি এটার নাম বলছিল বুরং রাজা।

দত্তদা বললেন, বুরং রাজা? কথাটা মালয়ী। মানে রাজা পাখি। কিং বার্ড। বুরং মানে পাখি। আরও আগে মালয়ীরা প্যারাডাইস বার্ডের কী নাম দিয়েছিল জানো?–মানুক দেওতা। মানে দেবতার পাখি। নিউগিনির ধারে কাছে কিছু জায়গায় পাখিকে বলে মানুক।

সত্যি, যা সুন্দর দেখতে, বলল তপন।

ঠিক রূপের জন্য নয়। নামটার আর একটা কারণ ছিল। বহুকাল ধরে নিউগিনি অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা ছাড়া এই পাখি কেউ জীবন্ত দেখেনি। নিউগিনির আদিবাসী জংলি পাপুয়ানদের কাছ থেকে মালয় বণিকরা কিনত শুধু মৃত পাখি–পালকসুদ্ধ দেহ। কিন্তু তাদের পা থাকত না। কেন জানি না পা কেটে ফেলা হত। মালয়ীদের তাই ধারণা হয়েছিল, এই জাতের পাখির পা নেই। তারা মাটিতে বা ডালে বসে না। সর্বদাই উড়ে

উড়ে বেড়ায়। খায় বৃষ্টির জল আর শিশির। এমন পাখি যার পা নেই, পালক এমন অপূর্ব সুন্দর, নিশ্চয়ই দেবলোক স্বর্গের পাখি। দেবপক্ষী বা দেবতার পাখি।

মালয়ীদের থেকে এই ধারণাটা হয় ইউরোপিয়ানদের। তাই পর্তুগীজরা এর নাম দেয় প্যারার-ডা-সোল। অর্থাৎ সূর্যের পাখি। ডাচরা বলে, অ্যাভিস প্যারালাইসিয়াস। মানে স্বর্গের পাখি। পরে অবশ্য জানা যায় এরা মর্তেরই পাখি এবং এদের দুটি পা-ও আছে। তবে নামের সঙ্গে স্বর্গ কথাটা জুড়ে গেল। বোধহয় ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে, প্রথম একজন ইউরোপিয়ান প্যারাডাইস-বার্ড জীবন্ত দেখে। এদের সম্পর্কে প্রথম বিস্তারিতভাবে লেখেন চার্লস ডারউইনের বন্ধু প্রাণিবিদ আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস, ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে।

ওটা কাছে নিয়ে এসো তো। দেখি স্পিশিসটা কী? বুরং রাজা সাধারণত বলা হয় কিং বার্ড অফ প্যারাডাইসকে।

পাখিটা আনতে আনতে তপন বলল, এর আরও স্পিশিস আছে নাকি?

আছে বইকি! প্যারাডাইসেমিডেয়ি পরিবারে প্রায় চল্লিশ রকম স্পিশিস অর্থাৎ প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের পালকের রং ও আকার নানারকম।

পাখিটা হাতে নিয়ে ডক্টর দত্ত বললেন, ও এই জন্যে, এই খুঁতগুলোর জন্যে এত সস্তায় ছেড়েছে।

পাখিটা দেখতে দেখতে দত্তদা বললেন, জানো তো এরা কাকের জ্ঞাতি। একই গোত্রের পাখি।

বলেন কী!

হুঁ, প্রকৃতির কী অদ্ভুত খেয়াল। আর এই পালকের বাহার শুধু পুরুষ পাখিদের। মেয়ে প্যারাডাইস বার্ড দেখতে নেহাৎ সাদামাটা। নাঃ, এটা তো ঠিক কিং বার্ড অফ প্যারাডাইস নয়। একটু অন্যরকম। আচ্ছা, টেবিল থেকে ওই লাল মলাটের মোটা বইটা দাও দেখি।

তপন বইটার নাম দেখল–বার্ডস অফ নিউগিনি অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়া! বইয়ের পাতায় পাতায় রঙিন ছবি। একজায়গায় পরপর দশটি পাতায় শুধু নানারকম বার্ড অফ প্যারাডাইসের ছবি। দত্তদার নজর একবার ছবির দিকে, আর একবার পাখিটার দিকে যায়। তপন চুপ করে দেখে। প্রত্যেক ছবির তলায় নাম লেখা। যেমন–রেড বার্ড অফ প্যারাডাইস, গ্রেট বার্ড অফ প্যারাডাইস, কিং বার্ড অফ প্যারাডাইস, প্রিন্স রুডলফ বার্ড অফ প্যারাডাইস–এমনি সব নাম।

দশটি পাতাই ওল্টানো হল। ডক্টর দত্তর ভুরু কুঁচকে গেছে। বললেন, স্ট্রেঞ্জ! একটার সঙ্গেও মিলল না। আমার ধারণা এই বইয়ে এ পর্যন্ত পাওয়া সব প্যারাডাইস বার্ড-এর

ছবি আছে। এ কি তবে নতুন স্পিশিস? আচ্ছা আর একটু খুঁজব আমি। ওঃ তপন, তুমি একটা দারুণ জিনিস দিয়েছ।

.

পরদিন বিকেলে তপন দোকান থেকে বেরিয়ে সোজা হাজির হল দত্তদার বাড়ি। দত্তদা তপনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন ড্রইংরুমে। তপনকে দেখেই বললেন, এটা নতুন স্পিশিস, আই অ্যাম অ্যাবসোলিউটলি সিওর। কোথাও এর রেফারেন্স নেই। তোমাকে পা ইং-এর দোকানে যেতে হবে, আজই। জানতে হবে এই পাখি সে কীভাবে পেয়েছে, কে দিয়েছে, কোথায় পাওয়া গেছে? আমি যাব না আজ। পাইং আমায় চেনে। হয়তো ঘাবড়ে যাবে আমায় দেখলে। কারণ এসব জিনিস চোরাপথে আসে। তুমি বিদেশি, তোমার কাছে হয়তো মুখ খুলতে পারে সহজে। তবে তোমায় না বললে, তখন জোর করতেই হবে। সে-ব্যবস্থা আমি করব। তুমি সোজাসুজি জিজ্ঞেস কোরো না। কথার ছলে জেনে নেবে। উইশ ইউ গুড লাক।

পা ইং-এর কিউরিও শপ ফাঁকাই ছিল। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল তপন। পা ইং উঠে দাঁড়াল। তার সোনা বাঁধানো দাঁতটি ঝিলিক দিল। দু-দিন আগের খদ্দের ফের ফিরে এসেছে দেখে সে ভারি খুশি। হাত বাড়িয়ে বলল, ওয়েল কাম।

কাছে গিয়ে তপনের চোখ পড়ল দোকানের ভিতরে পা ইং-এর কাছে আর একটি লোক চেয়ারে বসে। এতক্ষণ সে দেখতে পায়নি। লোকটি এদেশীয়। চিনা বা মালয়ী। বেঁটে গাট্টাগোট্টা। পরনে ছাই রঙের স্যুট, হাতে জ্বলন্ত চুরুট। বয়স বোঝা গেল না, তবে নেহাৎ ছোকরা নয়।

কীভাবে আসল কথাটা পাড়বে তপন মনে মনে ভেবে গিয়েছিল। কিন্তু অচেনা লোকের সামনে ও-প্রসঙ্গ তুলতে চাইল না। এটা-সেটা দেখে সময় কাটাতে লাগল। লোকটা কি উঠবে না? কে লোকটা?

পা ইং একটার পর একটা জিনিস নামিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছে। আর তপন এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন সব কটাই তার বেজায় পছন্দ। তপনের বেশি জিনিস কেনার সামর্থ নেই তা বুড়ি বোঝে। তবু তার আগ্রহ দেখে একটু স্নেহ ভরেই বোঝাতে লাগল। জিনিসগুলোর বিশেষত্ব, তার সেই অদ্ভুত ইংরেজি আর থাই মেশানো ভাষায়।

স্যুট-পরা লোকটি বসে বসে চুরুট টানছে। অধৈর্যভাবে তাকাচ্ছে। শেষে উঠেই পড়ল। পা ইংকে দুর্বোধ্য ভাষায় কয়েকটা শব্দ বলে বেরিয়ে গেল। তপনের মনে হল ও চিনা ভাষা বলল।

কয়েক মিনিট বাদেই আসল কথাটি পাড়ল তপন। মাদাম সেই দিনের পাখিটা চমৎকার। ওটা আমি দেশে নিয়ে যাব। সাজিয়ে রাখব ড্রইং রুমে।

উ উ–পা ইং খুশির আওয়াজ করল। বলল, এখানে তুমি কী করতে এসেছ?

চাকরি। বছরখানেক বাদে ফিরে যাব দেশে–ইন্ডিয়া। ক্যালকাটা।

বুড়ি ঘাড় নাড়ল। ক্যালকাটার নাম সে জানে।

তপন জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা মাদাম, ওই পাখিটা পেলে কীভাবে?

হোয়াই? পা ইং-এর চোখ কুঁচকে যায়।

মানে ওই পাখি শুনেছি খুব গভীর জঙ্গলে থাকে। ওটা মারতে নিশ্চয়ই ওইরকম জঙ্গলে যেতে হয়েছে। খুব অ্যাডভেঞ্চার হয়েছে। আসল কথাটা বলি–আমি গল্প লিখি। অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। অনেকগুলো বই আছে আমার। ওই পাখির শিকারের অ্যাডভেঞ্চারটা যদি জানা যায়, ঢুকিয়ে দেব আমার কোনো গল্পে। দারুণ জমবে।

উ রাইতার! পা ইং-এর নরুণ-চেরা চোখে বিস্ময় জাগল। বলল, কী ভাষায় লেখো?

বেঙ্গলি।

পা ইং হতাশভাবে ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ সে বাংলা জানে না।

এই পাখিটা তুমি ধরেছ? জিজ্ঞেস করল তপন।

নো নো।

যে ধরেছে তার সঙ্গে দেখা হয় না?

হতে পারে, পা ইং মাথা দোলায়। তার মনে আর সন্দেহ নেই। তপনকে ঠাউরেছে নেহাৎ এক কল্পনাবিলাসী লেখক। এর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে ভয় কী? বরং মজাই পাচ্ছে। পা ইং নিজের মনেই বলল, জিয়ান কী আর মেরেছে পাখিটা? না কেউ দিয়েছে : ওকে? কে জানে!

জিয়ান কে? প্রশ্ন করল তপন।

ওই পাখির মৃতদেহটা যে আমায় বিক্রি করেছে। তারপর আমি স্টাফ করেছি, উত্তর দিল পা ইং।

কী করে সে? কোথায় থাকে?

থাকে সিঙ্গাপুরে। এখন ব্যাংককে আছে। জিয়ান একজন নাবিক। মালয়ী।

অ্যাঁ! সেলার। তপন একেবারে হামলে পড়ল, ওঃ! কক্ষনো কোনো নাবিকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। কত দেশ, কত সমুদ্র ঘুরেছে! কত অ্যাডভেঞ্চার! ভাবতেই পারি না। ওর গল্প আমায় শুনতেই হবে। জিয়ানের সঙ্গে কী করে দেখা করা যায়? বলো। বলো–প্লিজ।

পা ইং হেসে বলল, হবে হবে। জিয়ানের ঠিকানা আমি জানি না, তবে কাল ও আসবে। এখানে। আমার কাছে টাকা পাবে। ওকে বলব তোমার কথা। জিয়ান মাই ডিয়ার লোক। খুব ঘুরেছে। বেশ গল্প বলে। তোমার কাজে লাগতে পারে।

নিশ্চয় লাগবে। আলবৎ লাগবে। রিয়াল লাইফ অ্যাডভেঞ্চার, তপন উত্তেজিত, কাল সকালে আসবে? কখন? ইংরেজি জানে? বেশ বেশ। আমি আসব তাহলে দশটা নাগাদ। জিয়ান আগে এসে গেলে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে বোলো। বলবে, আমায় গল্প শোনালে ওকে খুব ভালো প্রেজেন্ট দেব। প্লিজ বোলো কিন্তু–

ঠিক আছে, ঠিক আছে। পা ইং আশ্বাস দিল।

পা ইং-এর কাছে বিদায় নিয়ে তপন দত্তদাকে রিপোর্ট করল।

দত্তদা বললেন, তুমি জিয়ানকে নিয়ে তোমার ঘরে যাবে। আমিও হাজির হব তোমার ঘরে। সেখানে কথা হবে। পাখিটা নিয়ে যাও। তোমার ঘরে সাজিয়ে রাখো। অন্য কথা বলতে বলতে পাখির কথায় আসবে। আমার পরিচয় দিও–চেনা লোক। অ্যাডভেঞ্চারের গল্পের ভীষণ ভক্ত। টিচার। ভ্রমণ কাহিনি লেখে। জিয়ানের কথা শুনে থাকতে পারিনি। কিছু ভালোমন্দ খাবার-দাবারের ব্যবস্থা রেখো। তোয়াজ করতে হবে। যদি দামি খবর কিছু দেয় তখন আরও খাতির দেখানো যাবে।

গোবিন্দ সিং-এর কাছে ছুটি নিয়ে তপন সকাল দশটা নাগাদ পা ইং-এর দোকানে। হাজির হল। কাউন্টারের ভিতরে একটি লোক বসেছিল, সে উৎসুক চোখে দেখল তপনকে। পা ইংলোকটিকে দেখিয়ে বলল, এই হচ্ছে জিয়ান। বসিয়ে রেখেছি তোমার জন্যে।

জিয়ান তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল। জিয়ানের চেহারা রোগা পাকানো। মাঝারি লম্বা। হাত দুটো শিরাবহুল, তাতে ভর্তি উল্কি। খুদে খুদে চোখ দুটো পিটপিট করছে। পরনে হলুদের ওপর কালো ডোরা কাটা স্পোর্টস গেঞ্জি ও পুরনো নীল জিনস। পায়ে রবারের জুতো।

তপন কৃতার্থ হয়ে ইংরেজিতে বলল, আপনার কথা শুনেছি। আপনার গল্প শুনতে চাই। আমার কথা বলেছে কি পা ইং?

হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছি বইকি, জানাল পা ইং, রায় ইন্ডিয়ান। অ্যাভেঞ্চার রাইতার।

জিয়ান বেশ গর্বিতভাবে বলল, তা ঘুরেছি অনেক। প্রচুর অ্যাডভেঞ্চার করেছি বটে।

তপন বলল, এখানে গল্প জমবে না, খদ্দের আসবে, চলো, আমার ঘরে যাই। কাছেই মহারাজ রোডে। বেশ বসা যাবে। সে জিয়ানকে বেশি ভাবনা-চিন্তার সুযোগ না দিয়ে প্রায়। ঠেলে বাইরে এনে ফেলল। একদফা ধন্যবাদ জানিয়ে আসল পা ইংকে। খানিকটা হেঁটে গিয়ে একটা ট্যাক্সি নিল।

তপনের ঘরে ঢুকেই জিয়ানের নজরে পড়ল টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা সেই বার্ড অফ প্যারাডাইস।

তপন হেসে বলল, চিনতে পারছ? তোমার সেই পাখি। আমি কিনেছি। চমৎকার।

জিয়ান বসল। তপন তৎক্ষণাৎ তার সামনে এগিয়ে দিল এক বোতল উত্তম সুরা। তারপর এক প্যাকেট দামি সিগারেট সামনে রেখে বলল, দাঁড়াও, পাশের দোকান থেকে গরম গরম মাংসের চপ নিয়ে আসি। হ্যাঁ–আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক, বাঙালি, তাকে বলেছিলাম তোমার কথা। তিনি তোমার গল্প শুনতে চান। খুব ধরেছিলেন আমায়। ভদ্রলোক টিচার, লেখেন-টেখেন–ভ্রমণ কাহিনি। এসে পড়তে পারেন। তোমার আপত্তি নেই তো?

একটা সিগারেট ধরিয়ে জিয়ান ঘাড় নেড়ে জানাল–না না, আপত্তির কী? তার মুখে গর্ব ও আত্মপ্রসাদ। সে বুঝে নিয়েছে, এই বিদেশিদের চোখে সে একজন হিরো। তার অতি কষ্টকর একঘেয়ে নাবিক জীবনের অভিজ্ঞতা কেউ যে এত আগ্রহ করে শুনতে চায়, সে বোধহয় এই প্রথম জানল।

তপন বাইরে গিয়ে দত্তদাকে টেলিফোন করল।

মিনিট পনেরোর ভিতর দত্তদা এসে পড়লেন। জিয়ানের সঙ্গে তার পরিচয় হল। তিনজনে বসল। জিয়ানের খাবার চটপট শেষ। বোতলের পানীয় ঢেলে অল্প অল্প চমক দিতে দিতে সিগারেটে টান মেরে জিয়ান বলল, কোথাকার গল্প শুনবেন? প্যাসিফিক? সাউথ সী আইল্যান্ডস না অ্যাটলান্টিক? আমি ক্যালকাটাতেও গেছি।

আগে সাউথ সীর কথাই বলো, দত্তদার অনুরোধ।

বাঁকা বাঁকা ইংরেজিতে জিয়ান বলে চলে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা। প্রায় একঘণ্টা কাটল। দত্তদা গোপনে ইশারা করলেন তপনকে–অর্থাৎ এবার পাখির কথা পাড়ো।

জিয়ানের সমুদ্র জীবনের কাহিনি; নতুন দেশ, নতুন জাতি; নতুন নতুন বন্দর। ঝড়ে পথ হারিয়ে দিক-দিশাহীন সাগরবক্ষে ভেসে চলা। কত অজানা প্রাণীর দেখা পাওয়া। কূলহীন

অতল সাগরগর্ভে কত অজানা বিস্ময়, রোমাঞ্চ, ভীতি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছিল ওর একার জীবনে এত কাণ্ড সত্যি ঘটেছে কি না! হয়তো বা গুণমুগ্ধ শ্রোতা পেয়ে অন্যের কাছে শোনা গল্প ও নিজের নামে চালাচ্ছে। তবু তপনের চমৎকার লাগছিল। পাখির ব্যাপারটা না থাকলে খুশিমতো বলতে দিত জিয়ানকে।

গল্পের স্রোত একবার থামতেই তপন জিজ্ঞেস করল–আচ্ছা, এই পাখিটা কোত্থেকে পেলে? এ পাখি তো ঘোর জঙ্গলে থাকে শুনেছি।

তা বটে, টেবিলে খাড়া করা পাখিটা দেখে নিয়ে গম্ভীরভাবে জানাল জিয়ান।

পাহাড়ে উঠতে হয়েছিল বুঝি? তপনের আগ্রহভরা প্রশ্ন।

না, দ্বীপ। ভীষণ জঙ্গুলে দ্বীপ, বলল জিয়ান।

দ্বীপ? কোথায়? এবার প্রশ্ন করেন দত্তদা।

ওয়াইজিওর কাছে, দক্ষিণ-পশ্চিমে, ডেম্পিয়ার প্রণালীতে ঢোকার মুখে, মেসমন আইল্যান্ডস। উঃ, সেবার ঝড়ে মারা পড়েছিলাম আর কী!

কী রকম? কী রকম? ওখানে গিয়েছিলে কী করতে? বলল তপনদা। মলা সাগরে কচ্ছপ ধরতে বেরিয়েছিলাম একদল জেলের সঙ্গে। জাহাজের কাভা ছিল না তখন। ভাবলাম এইভাবে দু-পয়সা রোজগার করি। নির্জন দ্বীপের বেলাভূমিতে কচ্ছপ ডিম পাড়ে। আচ্ছা গাড়ে। সেখানে তাদের ধরা যায়।

পাখিটাকে কি তুমি নিজে শিকার করেছিলে? কোন দ্বীপে? নিশ্চয়ই খুব অ্যাডভেঞ্চার হয়েছিল? বলো, বলো, শুনি। ডক্টর দত্তর কণ্ঠে অধীর আগ্রহ।

জিয়ান থমকে গেল। বলল, না, ঠিক নিজে মারিনি, পেয়েছি একদল সামুদ্রিক জিপসির কাছ থেকে। তবে দ্বীপটা জানি, ওরা দেখিয়ে দিয়েছিল।

সেই দ্বীপটায় গিয়েছিলে তোমরা? ডক্টর দত্তর প্রশ্ন।

না। তখন আমরা ফিরছি। মেস্‌মন আইল্যান্ডস-এর একটা ছোট দ্বীপে থেমেছি। সেখানে জিপসিরা এল নৌকায়। ওদের কাছে মরা পাখিটাকে দেখলাম। চমৎকার পালক দেখে কিনে নিলাম, একখণ্ড কাপড়ের বদলে।

কী করে পেয়েছে ওটা বলল জিপসিরা? প্রশ্ন করল তপন।

বলেছিল। মৃত অবস্থায় সমুদ্রের জলে ভাসছিল একটা দ্বীপের পাশে। বোধহয় ঝড়ের তোড়ে ছিটকে পড়েছিল জলে। আমাদের একজন জেলে পাখিটার পেট-টেট কেটে পরিষ্কার করে দিল। তবে বেটা আনাড়ি ছিল। কেটে-কুটে নষ্ট করে দিল পাখিটা। নইলে ভালো দাম পেতাম।

দত্তদা আনমনে ভাবছেন কিছু। তপন কথা চালাতে জিজ্ঞেস করল, জিয়ান, তুমি তিমি শিকার দেখেছ?

দেখেছি বইকি। জিয়ান ফের বক্তৃতা শুরু করে।

মিনিট দশ বাদে দত্তদা বলে উঠলেন, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। ওই দ্বীপে আমি যাব, যে দ্বীপের পাশে পাখিটা ভাসছিল। তুমি হবে আমার গাইড। ওই দ্বীপে নিশ্চয় এরকম পাখি আরও আছে। সেই পাখিদের ফোটো তুলব। জীবন্ত পাখির মুভি ফোটোগ্রাফ। দারুণ হবে। ভয় নেই তোমার লোকন করব না। জাহাজে তুমি যা মাইনে আর যা যা পাও তাই দেব আমি।

এই পাখি? জিয়ান আমতা আমতা করে।

জিয়ানের মুখের ভাব দেখে দত্তদা বললেন, কেন, দ্বীপটা তো তুমি চেনো। ওই দ্বীপে গেলে এই পাখি ঠিক খুঁজে পাব।

হ্যাঁ, তা চিনি। তবে চোখে দেখিনি। জিপসিরা দেখিয়ে দিয়েছিল কোম্বারে। মেসমন আইল্যান্ডস-এর একদম পুবে। আমরা যে দ্বীপে গিয়েছিলাম তার থেকে বেশি দূরে নয়। পাখির দেহটা তখনো বেশ টাটকা ছিল। তবে ঠিক কোন দ্বীপটা কে জানে!

কেন, ওখানে কি অনেক দ্বীপ?

হ্যাঁ, অনেকগুলো, আর সবকটাই জঙ্গুলে। বেশির ভাগেই মানুষ থাকে না। কখনো আর যাইনি ওদিকে। শেষে যদি পাখি পাওয়া না যায়? এত কষ্ট করে যাবেন? জিয়ান যেন ভরসা পায় না। সে বলল, বুরং রাজা তো অন্য জায়গাতেও আছে।

না না, আমি ওইখানেই যেতে চাই, দত্তদা জোর দিলেন, প্যারাডাইস বার্ডের ফোটো তুলতে না পারলেই বা কী? খাসা একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে। ভ্রমণ কাহিনি লিখে ফেলব। ওখানকার দ্বীপে ঘুরে ঘুরে ফোটো তুলব। জিপসিদের সঙ্গে যে দ্বীপে দেখা হয়েছিল সেখান অবধি চিনে যেতে পারবে তো?

হ্যাঁ, তা পারব।

ব্যস, তাহলেই হবে। তোমার কি এখন জাহাজে কাজ আছে?

না। তবে সাত-আট দিন বাদে একটা জুটবে।

দরকার নেই তোমার ও কাজে। আমরা সপ্তাহখানেকের ভিতরেই বেরিয়ে পড়ব।কাল এসো এখানে। আমার বাড়ি নিয়ে যাব। তারপর সব প্ল্যান ছকে ফেলব। কি, রাজি? জিয়ান বলল, অলরাইট। তবে কাল নয়, পরশু আসব, সন্ধে ছটা নাগাদ।

অমনি দত্তদা উঠে দাঁড়িয়ে সাড়ম্বরে করমর্দন করলেন জিয়ানের সঙ্গে। তারপর বললেন, বারোটা বাজে। চলো বাইরে কোথাও লাঞ্চ খাওয়া যাক। আমার মোটর আছে বাইরে। চলো–

এক নামকরা চিনা হোটেলে তিনজনে খেতে ঢুকল। জিয়ানকে দেখে মনে হচ্ছিল বেজায় খুশি। এমন খাতির-যত্ন তার ভাগ্যে কদাপি জুটেছে কিনা সন্দেহ। লোকটি বকে একটু বেশি। ফুর্তির চোটে সমানে কথা বলে চলেছে। মেনু এল। জিয়ানকে অনুরোধ জানানো হল খাবার পছন্দ করতে। সে একধারসে অর্ডার দিল–বার্ড-নেস্ট স্যুপ, চাওমিন, ডাক রোস্ট, গলদা চিংড়ি ভাজা ইত্যাদি। ভক্তদের পকেট হালকা করতে তার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই। পয়সা বেশ খরচা হলেও খাওয়াটা হল তোফা।

বেলা একটা নাগাদ জিয়ান ঘড়ি দেখে বলল, এবার আমি উঠি। ব্লু-ড্রাগনে একজন আমার জন্য অপেক্ষা করবে। পরশু আসব মিস্টার রায়ের ঘরে সন্ধে ছটায়।

ব্লু-ড্রাগন কী? জিজ্ঞেস করল তপন।

রেস্টুরেন্ট, জবাব দিল জিয়ান।

সকলে উঠে পড়ল। জিয়ান বিদায় নিল। তপন ডক্টর দত্তর সঙ্গে গেল তার বাড়ি।

গাড়িতে যেতে যেতে তপন জিজ্ঞেস করল, দত্তদা, ওয়াইজিও কোথায়? আর মেস্‌মন আইল্যান্ডস?

বাড়ি চলো দেখাচ্ছি, দত্তদা জবাব দিলেন।

.

০৩.

দত্তদার পড়ার ঘরের দেওয়ালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মস্ত একখানা ম্যাপ ঝোলানো। দত্তদা দেখালেন, এই দেখ ডাচ নিউগিনির উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত। তারপর সমুদ্র। ডেম্পিয়ার প্রণালী। তার উত্তরে এই ওয়াইজিও দ্বীপ। প্রায় নিরক্ষরেখার ওপরে। আর ওয়াইজিওর একটু নীচে দক্ষিণ-পশ্চিমে এই যে ফুটকিগুলো, এই হচ্ছে মেস্‌মন আইল্যান্ডস। এই দ্বীপগুলো ছোট ছোট, জঙ্গুলে, ভলক্যানিক বা কোরাল আইল্যান্ড।

বেশির ভাগেই মানষের বসতি নেই। অস্বাস্থ্যকর। কাঠ, জায়ফল, নারকেল ইত্যাদির খোঁজে লোক এসব দ্বীপে কখনো কখনো যায় বটে, কিন্তু থাকে না। মেস্‌মন আইল্যান্ডস-এর দ্বীপগুলোর আলাদাভাবে নাম দেওয়া নেই। ম্যাপে পয়েন্ট-আউট করা হয়নি ভালোভাবে। কিন্তু তপন আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে–

কী?

এটা ডিক্সন দ্বীপের পাখি।

--ডিক্সন দ্বীপ?

–নামটা আমার দেওয়া। জন ডিক্সন ছিল একজন অর্নির্থলজিস্ট অর্থাৎ পক্ষিবিদ। বিশেষত বার্ড অফ প্যারাডাইস স্পেশালিস্ট! পাঁচ বছর আগে ম্যানিলায় এক কনফারেন্সে ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়। কথায় কথায় ডিক্সন বলেছিল যে ও একটা এক্সপেরিমেন্ট। করছে। পাপুয়া নিউগিনি থেকে কয়েক জাতের প্যারাডাইস বার্ড এনে মলুক্কা সী-তে একটা জনহীন জঙ্গুলে দ্বীপে ছেড়েছে। দেখা যাক তাদের মধ্যে মিশ্রণ ঘটে নতুন স্পিশিস তোর হয় কিনা! প্যারাডাইস বার্ডস-এর মধ্যে একরকম মিশ্রণ ঘটেছে আগে। ডিক্সন খুব গোপনে করেছে ব্যাপারটা। সেই দ্বীপটা যে ঠিক কোন জায়গায় বলতে চায়নি ডিক্সন। শুধু বলেছিল, মেস্‌মন আইল্যান্ডস-এ।

আমি বলেছিলাম, দ্বীপে ছাড়লে? যদি লোকে জানতে পারে, সব ধরে মেরে সাফ করে দেবে। জানোই তো বার্ড অফ প্যারাডাইস-এর কী ভীষণ দাম! উত্তরে ডিক্সন বলেছিল, একটা চান্স নিয়েছি। বন্য পরিবেশ ছাড়া এদের মিশ্রণ ঘটে না। তেমন রিজার্ভ-ফরেস্ট পাচ্ছি কোথায়? দ্বীপ হলে পাখিগুলো একটা জায়গায় আটকে থাকবে। যদি সফল হই, ওখানে তৈরি নতুন স্পিশিস নিয়ে গিয়ে অন্য জঙ্গলে বা রিজার্ভ ফরেস্টে ছাড়ব। তবে। এমন দ্বীপে ছেড়েছি যেখানে কেউ পা দেয় না। তাই ভরসা এখুনি কেউ টের পাবে না। তবে যত তাড়াতাড়ি পারি পাখিগুলোর প্রোটেকশনের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তোমায় লিখব তখন, সাহায্যের জন্য।

দুঃখের বিষয়, এর তিন মাস বাদে মোটর অ্যাক্সিডেন্টে ডিক্সন মারা যায়। তাই ওর দ্বীপের হদিশও গোপন থেকে যায়। আমার বিশ্বাস, জিয়ানের পাওয়া স্পেসিমেনটা ডিক্সনের তৈরি কোনো নতুন প্রজাতি। ডিক্সন দ্বীপের পাশেই সমুদ্রে পেয়েছিল জিপসিরা! কারণ পাপুয়া-নিউগিনির কাছাকাছি মিশুল, আরু, জোবি ইত্যাদি কয়েকটা দ্বীপে বার্ড অফ প্যারাডাইস পাওয়া যায় বা আগে পাওয়া যেত, কিন্তু মেস্‌মন আইল্যান্ডস-এ এই পাখি পাওয়া গেছে বলে কখনো শুনিনি। এইজন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্বীপটা আবিষ্কার করা দরকার। পাখিগুলোর রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন কোনো স্পিশিস পেলে নিয়ে গিয়ে চিড়িয়াখানায় রাখব বা রিজার্ভ-ফরেস্টে ছাড়ব।

.

পরদিন বিকেলে তপন গোবিন্দ সিং-এর অফিস থেকে নিজের ঘরে ফিরে দেখে দরজার তালাটা ভাঙা। সে ঘরে ঢুকল। আলনায় ঝোলানো একটা নতুন শার্ট নেই এবং টেবিলের ওপর বসানো তার প্যারাডাইস বার্ডটি উধাও। ঘরে আর কোনো জিনিস বেপাত্তা হয়নি। চুরি করার মতো দামি জিনিস কী বা আছে তার? কিন্তু পাখিটা নিল কেন? এ-বস্তুর দাম কি চোর জানে? আশ্চর্য!

তপন থাকে এক তলায় একখানা ঘরে। এক তলার বাকি অংশে থাকে এক বর্মী পরিবার স্বামী ও স্ত্রী। তারা দুজনেই দিনের বেলা চাকরি করতে বেরিয়ে যায়। তাদের দরজায় তালা দিব্যি ঝুলছে। দোতলায় থাকে এক পরিবার। তারা একতলায় নজর রাখে না। তপন তক্ষুনি টেলিফোন করল দত্তদাকে।

দত্তদা আধঘণ্টার মধ্যে হাজির হলেন। ব্যাপার দেখে তিনি থ। বললেন, ইস, পাখিটা আমার এখান থেকে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। গতকাল সময় পেলাম না আসতে।

পুলিসে ডায়রি করা হল।

একটা স্টাফ-করা পাখি এবং একখানা মাত্র শার্ট খোয়া গেছে জেনে ইন্সপেক্টর চুরির ব্যাপারে বিশেষ গা করলেন বলে মনে হল না।

থানা থেকে বেরিয়ে দত্তদা বললেন, স্পেসিমেনটা হারাল, এটা মস্ত ক্ষতি। ও-পাখির রং চেহারা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। দেখলে ঠিক চিনব। এখন জিয়ান আসুক।

স্টাফ-করা পাখিটা চুরি যাওয়ার পরদিন সন্ধ্যা ছটায় তপনের ঘরে জিয়ানের আসার কথা ছিল। বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত নটা অবধি দত্তদা ও তপন অপেক্ষায় রইল। জিয়ান এল না।

পরদিনও এল না জিয়ান। দুশ্চিন্তায় দত্তদার মুখ কালো হয়ে গেল। কী ব্যাপার? জিয়ানের ঠিকানা তারা জানে না। জিজ্ঞেস করেছিল, জিয়ান এড়িয়ে গেছে–এক ফ্রেন্ডের কাছে থাকি। সে আপনারা খুঁজে পাবেন না। বোঝা গিয়েছিল কোনো ঘুপচি নাবিকদের আস্তানায় তার বাস। সেখানে তপন বা ডক্টর দত্তর আগমন তার পছন্দ নয়।

দত্তদা তপনকে পা ইং-এর দোকানে পাঠালেন জিয়ানের খোঁজে। না, জিয়ান আসেনি। জিয়ান কোথায় থাকে তাও বুড়ি জানে না। বলে আসা হল, জিয়ান এলেই বলতে, তপনের কাছে যেন সে অবশ্যই যায়, ভীষণ দরকার।

পা ইং-এর দোকানে পরপর তিনদিন খোঁজ করেও জিয়ানের পাত্তা পাওয়া গেল না। মোটে আসেনি সে। পা ইং বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠল–কী এত দরকার? এত ঘনঘন খোঁজ?

তপন দত্তদার বাড়িতে বসে। একটি লোক এল। মাঝারি লম্বা, মজবুত গড়ন, চেহারায় মঙ্গোলীয় এবং শ্বেতাঙ্গের মিশ্রণ। লাল চুল, চৌকো চোয়াল, গায়ের রং লালচে, তবে নাক চাপা। সরু বাঁকা চোখ। দত্তদা ইংরেজিতে বললেন, এসো ডন, তোমাকে খুব দরকার। একজনের খোঁজ করতে হবে। নাম–জিয়ান, মালয়ী নাবিক। সে কোথায় থাকে জানি না, তবে ব্লু-ড্রাগন নামে একটা রেস্টোরেন্টে যায়। চেন ব্লু-ড্রাগন?

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল ডন। লোকটির দৃষ্টি স্থির, মুখে কোনো ভাবান্তর নেই।

ব্লু-ড্রাগন কোথায়? দত্তদার প্রশ্ন।

নদীর ধারে। জাহাজীদের আড্ডাখানা। ইংরেজিতে উত্তর দিল ডন।

তবে একবার খোঁজ করে এসো। জিয়ান কেমন দেখতে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার গাড়িটা নিয়ে যাও। হ্যাঁ, এ হচ্ছে তপন রায়–

ডন চলে গেল। দত্তদা তপনকে বললেন, ডন আমার অনেক অভিযানের সঙ্গী। ভালো শিকারী! ওর পূর্বপুরুষ ছিল পর্তুগীজ বোম্বেটে। ব্যাংককে থাকে। কাঠের ব্যবসা করে।

আধঘণ্টা বাদে ডন ফিরে এল। জানাল, ব্লু-ড্রাগনে জিয়ান যায় মাঝে মাঝে। তবে বেশ কয়েকদিন যায়নি। ও কোথায় থাকে কেউ বলতে পারল না। বলে এসেছি, জিয়ান এলে তাকে যেন মিস্টার রায়ের কাছে অবশ্য যেতে বলা হয়।

কিন্তু তবু জিয়ানের পাত্তা পাওয়া গেল না।

জিয়ানের সঙ্গে তপনদের শেষ দেখার পর আট দিন কেটে গেল। ডন প্রত্যেক দিন একবার ব্লু-ড্রাগনে খোঁজ নেয়। তপন যায় পা ইং-এর কাছে খোঁজ নিতে। কিন্তু জিয়ান যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ও ব্যাংককে আছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। দত্তদা দিনে দিনে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি শান্ত প্রকৃতির আমুদে লোক। কিন্তু এখন সর্বদা তার মুখ গম্ভীর। হলটা কী জিয়ানের? অ্যাক্সিডেন্টে পড়ল নাকি? ডনের সঙ্গে ইতিমধ্যে তপনের আলাপ গাঢ় হয়েছে। দুজন দুজনকে নাম ধরে ডাকে। তবে ডন কথা বলে খুব কম।

আট দিনের মাথায় ডন এসে খবর দিল, জিয়ান ব্লু-ড্রাগনে এসেছিল আজ সকালে। সঙ্গে আর একজন ছিল। মাঝারি হাইট। গাঁট্টাগোট্টা। ছাই রঙের স্যুট পরা। চুরুট খায়। রেস্টোরেন্টের বাকি পাওনা দিয়ে গেছে জিয়ান। কথাবার্তায় মনে হয়েছে, সে বাইরে যাচ্ছে কোথাও। অল্পক্ষণ থেকে দুজনে চলে যায় একটা ছোট কালো রঙের মোটরে চেপে। ব্লু-ড্রাগনের ম্যানেজার বলেছিল জিয়ানকে, তপন ও আপনার কথা। বোঝা যাচ্ছে, লাভ হয়নি। ও ইচ্ছে করেই আপনাদের এড়াচ্ছে।

জিয়ানের সঙ্গীর বর্ণনা শুনে তপনের ধাঁ করে মনে পড়ে গেল একজনের কথা। সে বলে উঠল, দত্তদা, ঠিক এমনি চেহারার একটা লোককে দেখেছিলাম পা ইং-এর দোকানে, যেদিন প্রথম পাখিটার বিষয়ে খোঁজ করতে যাই। পা ইং-এর সঙ্গে বসে গল্প করছিল। আমি ঢুকতে একটু বাদে বেরিয়ে যায়। ঠিক ওইরকম দেখতে আর চুরুট খায়। লোকটাকে ফের দেখেছি আমি। জিয়ানকে নিয়ে যখন আমরা লাঞ্চ খেয়ে বেরুচ্ছি চিনা হোটেল থেকে, সেই লোকটা রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে দেখছিল আমাদের।

দত্তদা যেন চমকে উঠলেন। উত্তেজিতভাবে বললেন, আরে একথা আগে বলোনি কেন? ডন, বুঝতে পারছ, লোকটা কে? নির্ঘাৎ চ্যাং। চ্যাং-এর তো একটা ছোট কালো গাড়ি আছে। এইবার আন্দাজ করছি ব্যাপার। তপন, চল এখুনি আমার সঙ্গে পা ইং-এর কাছে। ডন, আমি ফিরে এসে তোমায় টেলিফোন করব।

পা ইং-এর দোকানের উল্টো দিকে দত্তদা গাড়ি থামালেন।

দোকানে একজন খদ্দের ছিল। গাড়িতে বসে দত্তদা ও তপন অপেক্ষা করে। খদ্দেরটি বেরিয়ে গেলে দুজনে দোকানে ঢুকল।

দত্তদাকে দেখেই পা ইং প্রথমে কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। তারপর হেসে অভ্যর্থনা জানাল, ওয়েলকাম ওয়েলকাম, কী সৌভাগ্য আমার। মিস্টার দত্ত অনেক দিন বাদে। বলুন কী খুঁজছেন?–সেই থাই আর ইংরেজি মেশানো অদ্ভুত ভাষায়।

দত্তদা কোনো ভণিতা না করেই পা ইং-এর কাছে গিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ইংরেজিতে বললেন, পা ইং, আমি একবার তোমার উপকার করেছিলাম, মনে আছে?

আছে বইকি! পা ইং-এর হাসি মিলিয়ে যায়।

তবে আশা করি উপকারীর মর্যাদা দেবে। আমায় ঠকাবে না।

না না, এ কথা কেন?

বেশ, তাহলে বলো, এই তপন তোমার দোকান থেকে যে একটা স্টাফ-করা পাখি কিনে নিয়ে গিয়েছিল সে খবর কি চ্যাং জানে? আর পাখিটা সম্বন্ধে সে কি তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করেছে? আর জিয়ানের সঙ্গে কি তার আলাপ হয়েছে? সত্যি করে বলো।

পা ইং-এর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থেকে সে খুব নিচু স্বরে আস্তে আস্তে বলল, প্লিজ মিস্তার দত্ত, আমি সত্যি কথা সব বলছি।

কিন্তু চ্যাং যেন না জানতে পারে আমি আপনাকে এসব বলেছি। ও আমায় বারণ করে দিয়েছে বলতে। জান তো ও কী করম ভয়ঙ্কর লোক।

দত্তদা বললেন, বেশ, চ্যাং জানতে পারবে না, কথা দিলাম। এবার বলো।

পা ইং বলল, ওই রায় পাখিটা সম্বন্ধে খোঁজখবর করে বেরিয়ে যাবার পর চ্যাং ফের আসে। পাখিটা নিয়ে রায় খোঁজ করছিল জেনে কৌতূহলী হয়। জিয়ানের খোঁজখবর নেয়। পরদিন রায় জিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে যেতেই চ্যাং ওদের অনুসরণ করে।ও আমার শো-কেসের পিছনে লুকিয়ে ছিল কী কথা হয় শুনতে। আমায় ভয় দেখিয়ে বাধ্য করেছিল এই ব্যবস্থায়। এরপর চ্যাং কী করেছে, না করেছে আমি কিছু জানি না, দিব্যি গালছি। এ শুধু আমায় নিষেধ করে যায় এই বিষয়ে কাউকে কিছু না বলতে। দোহাই মিস্তার, চ্যাং যেন জানতে না পারে আমি এসব বলেছি, তাহলে মারা পড়ব।

দত্তদা আর কথা না বাড়িয়ে বিদায় নিলেন। কেবল পা ইংকে বলে এলেন–জিয়ানের কোনো খবর পেলে আমায় জানিও।

পথে বেরিয়ে তপন জানতে চাইল, চ্যাং কে?

দত্তদা বললেন, নামে পশুপাখির ব্যবসায়ী, কিন্তু ওর আসল কারবার–দুর্লভ পশুপাখির চোরাই চালান। এই করে প্রচুর পয়সা কামিয়েছে। মহা ধূর্ত। পুলিস একবারও ওকে বাগে পায়নি। সাউথ-ইস্ট এশিয়ার অনেক দুষ্প্রাপ্য জন্তু ও পাখি ওর কল্যাণে নির্বংশ হতে চলেছে। আগের বছরই সুলু সাগরে ফিলিপিনো পুলিস একটা লঞ্চ আটক করে। তাতে পাওয়া যায়, খাঁচায় বন্দী ছটা লুচু র‍্যাবিট, দুটো ব্ল্যাক সেলিবিস এপ এবং তিনটি সেলিবিস দ্বীপের পিগমি বাফেলো। সব কটিই দুর্লভ প্রাণী। এদের ধরতে বা রপ্তানি করতে স্পেশাল পারমিশন নিতে হয়। জন্তুগুলি কে পাঠাচ্ছে, কার কাছে, কোনো হদিশই পাওয়া যায়নি। দেখা গেল সব ভুয়ো নাম-ঠিকানা। তবে কানাঘুষায় জানা যায় যে এটা চ্যাং-এর কীর্তি।

এসব প্রাণী কেনে কে? তপন জানতে চায়।

কিছু কেনে চিড়িয়াখানাগুলো। সোজা পথে না পেলে তারা এইভাবেও সংগ্রহ করে। তাছাড়া আছে বেশ কিছু প্রাইভেট কালেক্টর। নানা দেশের অনেক ধনীরই পশুপাখির শখ। তারা রীতিমতো চিড়িয়াখানা বানায়। তাতে দুর্লভ প্রাণী রাখা ভীষণ প্রেস্টিজের ব্যাপার। ফলে চোরা পথে, টাকার জোরে রেয়ার পশুপাখি জোগাড় করে। আর চ্যাং-এর মতো লোক আছে তাদের শখ মেটাতে।

এ ব্যবসায় তো খুব রিস্ক? বলল তপন।

তা বটে, তবে লাভও তেমনি। যেমন ধরো, ব্রেজিলের হায়াসিনথ ম্যাকাও-এর এক্সপোর্ট নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই পাখি চোরাই পথে বিক্রি হয় এক-একটি দশ হাজার ডলারে। চোরাবাজারে এমনি নিষিদ্ধ পাখি, একজোড়া অস্ট্রেলিয়ান গোল্ডেন সোলডার্ড প্যারাকীট বা ব্রাউন প্যারাকীটের দাম কমপক্ষে দশ-বারো হাজার ডলার।

তপন বলল, লুকিয়ে মেরে বাঘের চামড়া, গণ্ডারের সিং খুব দামে বিক্রি হয় শুনেছি। কিন্তু জ্যান্ত প্রাণীরও যে এমন চোরাই-চালান হয় জানতাম না।

হয় হয়, দত্তদার কণ্ঠে ক্ষোভ উত্তেজনা, এই প্রাইভেট কালেক্টরের শখ আছে, টাকা আছে, কিন্তু জ্ঞান কম। তাই রেয়ার স্পিশিস সংগ্রহ করে প্রায়ই তাদের বাঁচাতে পারে না। ফলে স্পিশিসগুলি সংখ্যায় দিন দিন কমছে।

দত্তদা বলে উঠলেন, বুঝছ ব্যাপার। পাখিটার বিষয়ে খোঁজ করার কথা চ্যাং-এর কানে যায়। তার সন্দেহ হয়। পরে জিয়ানকে ধরে। বুঝতে পারে দেশ-ভ্রমণ বা অ্যাডভেঞ্চারটা ছল। আসলে লক্ষ্য পাখিটা। হয়তো এটা দুর্লভ কোনো বার্ড অফ প্যারাডাইস এবং তুমি নয়, আসলে আমিই খোঁজখবর করছি। ওই ঠিক চুরি করেছে পাখিটা লোক দিয়ে। ওর মতলবটা কী?

মোটরে উঠে স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে খানিক চুপ করে বসে থেকে দত্তদা বললেন, চলো একবার চ্যাং-এর সঙ্গে মোলাকাত করে আসা যাক।

গাড়ি স্টার্ট নিল।

মিনিট দশেক এঁকেবেঁকে চলে থামল গাড়ি। পাড়াটা নির্জন। রাস্তা পেরিয়ে ওধারে একটা মাঝারি দোতলা বাড়ির নিচের দরজার বেল টিপলেন দত্তদা। একজন মালয়ী দরজা খুলে দিল। দত্তদা মালয়ী ভাষায় বললেন, মিস্টার চ্যাং আছেন?

লোকটি ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে রইল। জবাব দিল না।

দত্তদা ফের বললেন, বলো গিয়ে প্রফেসর দত্ত এসেছেন।

লোকটি তখনো চুপ। নড়ছেও না। এমন সময় তার পিছন থেকে কেউ ইংরেজিতে বলে উঠল, আরে প্রফেসর দত্ত! কী সৌভাগ্য! আসুন, আসুন।

তপন দেখল, সেই ছাইরঙা স্যুট পরা লোকটি। এখন অবশ্য তার পরনে হাফশার্ট ও ট্রাউজার্স। তবে ঠোঁটে সেইরকমই চুরুট। লোকটির কণ্ঠস্বরে বিনয় ও ভদ্রতা যেন ঝরে পড়ছে। মুখে বিগলিত হাসি।

ঝকঝকে সাজানো ড্রইংরুমে বসল তিনজনে। কোনো ড্রিঙ্কস? জানতে চাইল চ্যাং।

না, ধন্যবাদ, উত্তর দিলেন দত্তদা। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, মিস্টার চ্যাং, আমি একজনের খোঁজে এসেছি। লোকটির নাম জিয়ান। নাবিক! ওর কোনো হদিশ দিতে পারেন?

জিয়ান? চুরুটে একটা লম্বা টান মেরে ঊর্ধ্ব মুখে তাকিয়ে চ্যাং না জানার ভান করে।

দত্তদা দৃঢ়স্বরে বললেন, জিয়ানকে আপনি চেনেন মিস্টার চ্যাং, আমি ভালোভাবেই জানি।

তাই নাকি! কে বলল? চ্যাং-এর চোখ ছোট হয়।

কেউ বলেনি। তবে ব্লু-ড্রাগনে আপনাদের একসঙ্গে দেখা গেছে। ওর বিল আপনি মিটিয়েছেন। ব্লু-ড্রাগনের অনেকেই দেখেছে।

হুঁ। মনে পড়েছে। চ্যাং যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। লোকটা আমার কাছে ধার চাইল। কিছু। ব্লু-ড্রাগনের পাওনা শোধ করবে। নইলে নাকি রেস্টোরেন্টের ম্যানেজার ওকে ঠ্যাঙাবে। ওইখানেই জিয়ানের সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ হয়েছিল কয়েকদিন আগে। খুব ঝুলোঝুলি করতে মিটিয়ে দিলাম ওর ধার। বলেছে তো শোধ করে দিয়ে যাবে বাড়িতে এসে। জানি ওসব বাজে কথা। তবু জানেন তো, কেউ হাত পাতলে আমি না বলতে পারি না। চ্যাং উদার হাসি হাসল।

জিয়ানের ঠিকানাটা জানেন? বললেন দত্তদা।

নাঃ। তা, ব্যাপারটা কী? ওকে কী জন্যে দরকার? আপনারও টাকা মেরেছে নাকি?

না। অন্য একটা কাজ আছে। যাক, চলি এখন। দত্তদা উঠে পড়লেন।

ঠিক আছে, ও যদি আসে ধার শোধ করতে, ওর ঠিকানাটা নিয়ে রাখব, সবিনয়ে জানাল চ্যাং, তবে সে-আশা খুবই কম। চ্যাং-এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে তপনরা রাস্তায় দাঁড়িয়েছে। পিছনে চ্যাং-এর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। ঠিক তখুনি একটা প্রকাণ্ড ঝকঝকে মোটরগাড়ি এসে থামল সামনে। গাড়ির পিছনের দরজা খুলে নামল এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক–টকটকে রং, বেজায় মোটা, পরনে দামি স্যুট। লোকটিকে দেখে মনে হয় আধা-ইউরোপিয়ান।

আগন্তুক দত্তদাকে একমুহূর্ত ভুরু কুঁচকে দেখে চোস্ত ইংরেজিতে বললেন, হ্যাল্লো প্রফেসর, খবর ভালো?

দত্তদা কেমন আড়ষ্টভাবে বললেন, হুঁ।

চ্যাং-এর কাছে এসেছিলেন বুঝি? দেখা হল? বললেন আগন্তুক।

দত্তদা একবার মাথা নেড়েই পা চালালেন।

আবার শিগগিরি কোনো অভিযানে যাচ্ছেন নাকি? আমার সেই অফারটা কিন্তু মনে রাখবেন প্রফেসর। প্লিজ। আগন্তুকের কথা ভেসে এল।

দত্তদা থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফেরালেন। আগন্তুকের মুখে যেন বাঁকা হাসি।

ঝটিতি ফিরে দত্তদা গটগট করে নিজের গাড়িতে উঠলেন। তপন উঠে বসল পাশে। বাকি পথ দত্তদা থমথমে মুখে গাড়ি চালালেন। একেবারে চুপ। বাড়ি এসেই টেলিফোন করতে গেলেন ডনকে।

দত্তদা ফোন করে ফিরে আসতেই তপন বলল, ওই লোকটা কে? মস্ত গাড়ি থেকে নামল?

প্রিন্স, জবাব দিলেন দত্তদা, মানে আমরা প্রিন্স বলেই ডাকি। ওর আসল নাম হেনরি উয়ান। থাকে রেঙ্গুনে। মহা ধনী। গণ্যমান্য ব্যক্তি। রাজার মতোই বিলাসিতায় থাকে। ওর খুব পাখির শখ। ফেমাস বার্ড কালেক্টর। অনেক রেয়ার স্পেসিমেন আছে ওর সংগ্রহে। কিন্তু ইদানীং ওর অ্যামবিশন বেড়েছে। শুধু কালেক্টর নয়, আবিষ্কারক হতে চায়। তবে নতুন পাখির খোঁজে বন-জঙ্গলে ঘুরে দিনের পর দিন কষ্টভোগ করে অভিযান চালাবার মতো ধৈর্য ওর নেই। তাই টাকার জোরে আবিষ্কার কিনতে চায়।

আবিষ্কার কেনা! সে আবার কী! তপন অবাক।

অর্থাৎ অন্য কারও আবিষ্কার করা কোনো নতুন পাখি ও নিজের আবিষ্কার বলে চালাবে। তার জন্য প্রকৃত আবিষ্কারককে দেবে প্রচুর টাকা। এইভাবে কিনবে। তিন বছর আগে চ্যাং মারফত প্রিন্স আমার কাছে এইরকম এক প্রস্তাব পাঠায়। আমি তখন ইস্ট জাভার অঞ্চলে এক এক্সপিডিশনে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। প্রিন্স আমায় মোটা টাকা অফার করে এই শর্তে।

আপনার আবিষ্কার প্রিন্সের নামে চালাবে কীভাবে? ও যদি সঙ্গে না যায়? তপন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

খুব সোজা ব্যাপার, বললেন দত্তদা, ধরো আমি একটা নতুন পাখি আবিষ্কার করলাম। তার দু-একটা জীবিত বা মৃত স্পেসিমেন নিয়ে গেলাম। তাদের ফোটো তলে আনলাম। ফিরে এসে স্পেসিমেন এবং ফিলম-রোল সমর্পণ করলাম প্রিন্সের হাতে। আর কেউ জানবে না ব্যাপারটা। এরপর প্রিন্স ঘটা করে এক্সপিডিশনে যাবে সেই জঙ্গলে। পাখির দেখা পাক বা না পাক, ওখান থেকে একটু ঘুরে এসে ঘোষণা করবে যে সে একটি নতুন জাতির পাখি আবিষ্কার করেছে। লোককে দেখাবে, আমার দেওয়া স্পেসিমেন, এবং ফিলম থেকে ডেভেলপ করা ফোটো। ফলে আবিষ্কারক হিসেবে তার নাম রেকর্ডেড হয়ে যাবে। খুব সম্মান মিলবে। বদলে আমি পাব প্রচুর টাকা। চ্যাং পাবে মোটা

কমিশন। প্রিন্সের প্রস্তাব। আমি কড়াভাবে নাকচ করি। সেই থেকে চ্যাং এবং প্রিন্স আমার ওপর বেজায় চটা।

দত্তদা উত্তেজিতভাবে বললেন, চ্যাং ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে। জিয়ানকে ও ঠিক কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। তবে প্রথমে ভেবেছিলাম চ্যাং শুধু আমায় জব্দ করতে চায়। জিয়ানকে সরিয়ে দিয়ে আমার অভিযানটা ভেস্তে দিতে চাইছে। এবং হয়তো চুরি করা স্পিশিসটা বিক্রি করবে কোথাও। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এর পিছনে প্রিন্স আছে। ব্যাপারটা আরও গোলমেলে। আমি ডনকে বলেছি চ্যাং-এর ওপর নজর রাখতে।

দু-দিন বাদে বিকেলে ডন এসে জানাল, প্রফেসর দত্ত, খবর পেলাম চ্যাং আজ দুপুরে সিঙ্গাপুরে চলে গেছে প্লেনে। প্রিন্সও চলে গেছে ব্যাংকক থেকে।

দত্তদা একটুক্ষণ গুম মেরে থেকে বললেন, আমার বিশ্বাস, চ্যাং প্রিন্সকে জানিয়েছিল জিয়ানের আনা পাখির বিষয়ে আমার আগ্রহের কথা। তারপর প্রিন্সের নির্দেশেই চ্যাং ওটা চুরি করায়। এবং পাখিটা দেখে প্রিন্স ধরতে পেরেছে যে এটা নতুন স্পিশিস। এখন প্রিন্স নির্ঘাৎ চ্যাংকে পাঠাবে ওই পাখির খোঁজে। ওই টাকা জোগাবে। প্যারাডাইস বার্ড-এর নতুন স্পিশিসটা চ্যাং খুঁজে পেলে প্রিন্স তার আবিষ্কারটা কিনে নেবে। ফলে প্রিন্সের অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হবে। এর জন্যে সে প্রচুর টাকা ঢালতে পিছপা হবে না। হ্যাঁ, এর সঙ্গে আমাকেও জব্দ করাটা হবে ফাউ। এক ঢিলে দুই পাখি বধ।

নাঃ, আর একটা দিনও বাজে নষ্ট নয়। চ্যাং ঠিক ডিক্সন আইল্যান্ডের পথে রওনা হয়ে। গেছে। কিন্তু জন ডিক্সনের কীর্তি চুরি করে কেউ বিখ্যাত হবে, তা আমি হতে দেব না। ডন, চলো বেরোই, কাজ আছে।

দত্তদা ও ডন বেরিয়ে গেলেন। তপন তার ঘরে ফিরল।

.

০৪.

পরদিন সকালে দত্তদার বাড়ি হাজির হয়ে তপন দেখল সেখানে হুলুস্থুল চলছে। দত্তদার হাতে একটা লিস্ট। সামনে নানা আকারের কয়েকটা ব্যাগ। চারপাশে হরেক রকম জিনিস। ছড়ানো। বউদি সমানে এ-ঘর ও-ঘর ছুটছেন। রবি নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।

দত্তদা বললেন, বসো তপন, বসো। এই গোছগাছ করছি। বউদি তপনকে এক কাপ কফি ধরিয়ে দিলেন।

কোথায় যাচ্ছেন আপনি? তপন জিজ্ঞেস করল।

প্রথমে ওয়াইজিও, সেখান থেকে মেস্‌মন আইল্যান্ডস।

ওয়াইজিও কেন? চ্যাং কি ওখানে গেছে, হদিশ পেলেন?

না। চ্যাং-এর কোনো খবর পাইনি। তবে ডিক্সন বলেছিল, সে ওয়াইজিও থেকে মেস্‌মনের দিকে যাত্রা করে। গিয়ে খুঁজে দেখব, ডিক্সন কোন দ্বীপে গিয়েছিল কেউ বলতে পারে কিনা।

যদি তেমন কাউকে না পান?

তাহলে অগত্যা অজানার পথে পাড়ি। মেস্‌মনের পুব ধারের দ্বীপগুলো খুঁজে দেখব, যদিও কাজটা বেশ শক্ত।

একাই যাবেন?

না। ডনকে সঙ্গে নিচ্ছি। জিয়ানকে পেলে অবশ্য ডনকে দরকার হত না। বিশেষ খোঁজাখুঁজিও করতে হত না তাহলে।

আপনি আগে কখনো ওয়াইজিও গেছেন?

না।

ডন?

না ডনও যায়নি।

দ্বীপগুলো তো ভালো নয়, সেদিন বললেন।

হুঁ, মোটেই ভালো নয়। তাছাড়া ইকুয়েটরের ওপরে বলে ওই অঞ্চলে সারা বছর ঝড়-জল লেগেই থাকে।

তবে তো রিস্কি।

তা একটু। হাসলেন দত্তদা।

তপন বলল, বউদি, আপনি বারণ করছেন না যে?

বউদি হেসে বললেন, বারণ করলেই কী আর শোনে, যা মানুষ।

ব্যাগের স্ট্র্যাপ বাঁধতে বাঁধতে দত্তদা মুখ তুলে বললেন, এ ভারি জব্বর নেশা ভাই। একবার স্বাদ পেলে আর ছাড়ান নেই। একটা কবিতা পড়েছিলাম, বাংলা। কবির নামটা মনে নেই। কয়েকটা লাইন মুখস্থ করে রেখেছি।–

শুনে কাল হল ভাই।
অরণ্য-পথ গভীর গহন সাগরের তল নাই!

ঠিক লিখেছেন। আমার মনের কথা। অমন কোনো জায়গার কথা শুনলেই যে ছটফটিয়ে উঠি।

তপনের মনটা আনচান করে উঠল। ব্যাংককে এসে তার মনে হয়েছিল মস্ত এক অ্যাডভেঞ্চার করেছি। বেশ গর্ব হয়েছিল মনে মনে। কিন্তু সে এসেছিল পেটের দায়ে, বাধ্য হয়ে, অনেক সাতপাঁচ ভেবে। আর এই মানুষটি? কেমন সাজানো সংসার, চাকরি, নিশ্চিন্ত জীবন-সব ছেড়ে হুট করে পা বাড়াচ্ছেন অজানা পথে, বিপদের মাঝে, প্রায় শখ করে। নাঃ,-এর তুলনায় তার জীবনটা নেহাৎই সাদামাটা। অ্যাডভেঞ্চারের সে কিছুই জানে না।

খানিক চুপচাপ থেকে ধাঁ করে বলে বসল তপন, দত্তদা, আপনাদের সঙ্গে যেতে ভীষণ লোভ হচ্ছে।

হো-হো করে হেসে উঠলেন দত্তদা, বটে, বটে। কিন্তু ভাই এ লোভ না করাই ভালো।

সিরিয়াসলি বলছি দত্তদা।

ডক্টর দত্ত তীক্ষ্ণ চোখে তপনের দিকে তাকিয়ে বললেন, রিস্কগুলো খেয়াল আছে?

আছে।

কিন্তু তোমার চাকরি? ছুটি পাবে?

তা সত্যি। তপন দমে গেল। নতুন চাকরি। ছুটি কি আর দেবে?

দত্তদা উঠে এসে তপনের পিঠে হাত রেখে বললেন, দুঃখ কোরো না ভাই। যার অজানাকে জানবার ইচ্ছে আছে, বিপদে ঝাঁপ দেবার সাহস আছে, তার বরাতে অ্যাডভেঞ্চার ঠিক জুটে যায়। জীবনভোর সামনে দিয়ে কত রোমাঞ্চের সুযোগ পেরিয়ে যায়। কেউ তা দেখে এড়ায়। আর যে তাকে ধরতে চায়–ঠিক ধরে। তাই বলছি, হতাশ হয়ো না।

ধরুন যদি ছুটি পাই?

নিশ্চয়ই নেব তোমায়। খুশি হয়ে নেব। তোমার খরচাও কিছু লাগবে না। সে ভার আমার, বললেন দত্তদা।

.

দুপুরে গোবিন্দ সিংকে ব্যাপারটা বলল তপন।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সিংজি বললেন, তুমি সত্যি যেতে চাও?

হ্যাঁ। অবশ্য যদি ছুটি পাই। সবে জয়েন করেছি—

গোবিন্দ সিং-এর দাড়ি-গোঁফ ভরা মুখে বিচিত্র হাসি ফুটল। তিনি বললেন, বেশ, ছুটি তুমি পাবে। যাও। তোমার উৎসাহ দেখে আমি খুশি হয়েছি। এই তো দেখার বয়স। তোমার চেয়েও কম বয়সে আমি ঘর ছেড়েছি। কত দেশ ঘুরেছি। কত কী দেখলাম। এখনো ইচ্ছে করে বেরিয়ে পড়তে, কিন্তু আর তাগদ নেই। তবে হ্যাঁ, বৃদ্ধের পরামর্শ নাও তো বলি। রোজগার করাও দরকার। তাই চোখ-কান খোলা রাখবে। কোথায় কী রোজগারের ধান্দা জেনে নেবে।

একটা ঘটনা বলি শোনো। তখন আমার বয়স তিরিশ। ব্যাটাভিয়ায় এক রবার বাগানে কাজ করি। এক ফিলিপিনোর সঙ্গে ভাব হল। ফিলিপিনো জিপ একদিন বলল যে, সে

টরেস্‌স্ট্রেটে একটা ডুবে-যাওয়া জাহাজের খোঁজ পেয়েছে, তাতে অনেক দামি মাল আছে। একজন পার্টনার পেলে সে জাহাজটা খুঁজে দেখে। টরে-স্ট্রেট কোথায় জানো? অস্ট্রেলিয়া আর নিউগিনির মাঝখানে। ওখানে অগুনতি দ্বীপ আর ডুবো পাহাড়। রাজি হয়ে গেলাম। চলে গেলাম ওর সঙ্গে। একটা মোটর-বোট ভাড়া করলাম। ডুবুরির পোশাক কেনা হল। জিপই শেখাল আমায় সমুদ্রে ডাইভিং। জাহাজটা খুঁজেও পেলাম। খুব অ্যাডভেঞ্চার হল। আবার দু-পয়সা রোজগারও হয়ে গেল।

কী পেয়েছিলেন জাহাজটায়? তপনের ভারি আগ্রহ।

খুব দামি কিছু নয়। তবে অনেক রুপোর জিনিস ছিল। তাই বলছি, অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে পয়সার মতলবটাও ছেড়ো না। যদি কিছু মেলে মন্দ কী? জাহাজটা পেলাম ভালো, না পেতেও পারতাম।

আচ্ছা, তোমরা সিঙ্গাপুর হয়ে যাবে নিশ্চয়ই? ওখানকার এক পার্টি অনেকদিন ধরে আমায় মাল পাঠাচ্ছে না। চিঠি দিচ্ছি, উত্তর নেই। ঠিকানা দিয়ে দেব। ওদের সঙ্গে দেখা করে, কথা বলবে। আমি নিজেই একবার সিঙ্গাপুর যাব ভাবছিলাম। তুমিই ভারটা নাও। তাহলে ছুটির মাইনেটা পাবে।

তপন তক্ষুনি ফোন করল, দত্তদা, ছুটি মিলেছে। আমি যাচ্ছি।

.

ব্যাংকক থেকে রওনা হয়ে বর-কয়েক প্লেন বদল করে তপনরা পৌঁছল নিউগিনির উত্তর ভাগে সোবরাং বন্দরে। সোবরাং থেকে লঞ্চে ডেম্পিয়ার প্রণালী পেরিয়ে ওয়াইজিওর দক্ষিণ তটে মুকা গ্রামে হাজির হল।

মুকা ছোট্ট গ্রাম। সামনে সমুদ্র পিছনে চাষের ক্ষেত। তারপর বনজঙ্গল। একটি পাতা-ছাওয়া মাটির কুটিরে ওরা আস্তানা করল। এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা ওখানে সম্ভব নয়। দত্তদা ডনকে বললেন, খবর নাও, জন ডিক্সনকে কেউ চেনে কিনা? দেখ এমন কাউকে পাও কিনা যে ডিক্সনের সঙ্গে মেমেন আইল্যান্ডস, এ গিয়েছিল।

আগস্ট মাস। রাতে একদিন বৃষ্টি হল। ঘরের চাল চুঁইয়ে জল পড়ে। মশার প্রচণ্ড উৎপাত। রাতে ভালো ঘুম হয় না। তপন টের পেতে শুরু করল অ্যাডভেঞ্চারের ধকল। এ তো কলির সন্ধে। এখনো আসল অভিযানটাই বাকি। দত্তদা ও ডন কিন্তু নির্বিকার। কোনো অসুবিধাতেই তাদের যেন ভ্রূক্ষেপ নেই।

মুকার অধিবাসীরা মালয় ও পাপুয়ান জাতের মিশ্রণ। বছরের অনেকখানি সময় এরা সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়। মাছ, কাঁকড়া, কচ্ছপ ইত্যাদি ধরে। জংলি দ্বীপ থেকে ফল-পাকুড় সংগ্রহ করে আনে।

চারদিন কেটে গেল। ডিক্সনকে দেখেছে এমন দু-চারজনের খোঁজ মিললেও ওর সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করেছে তেমন কারও সন্ধান পাওয়া গেল না। দত্তদা অধীর হয়ে উঠলেন। জানালেন–আর দু-তিন দিন দেখব। কাউকে না পেলে গাইড ছাড়াই রওনা দেব।

চ্যাং বা জিয়ানের কোনো খবর মেলেনি। তবে একজন জেলে জানাল যে দুজন বিদেশিসহ একটা নৌকোকে তারা আমাহেরার দিক থেকে মেস্‌মনের দিকে যেতে দেখেছে।

ডন একটি বছর কুড়ির যুবককে দত্তদার কাছে নিয়ে এল। বলল, এ নাকি জানে ডিক্সন কোন্‌ দ্বীপে গিয়েছিল। এর নাম আলী। ও মালয় জানে।

তুমি ডিক্সন সাহেবের সঙ্গে গিয়েছিলে? দত্তদা মালয় ভাষায় আলীকে জিজ্ঞেস করলেন।

না। আমার বাবা গিয়েছিল। আমি বাবার কাছে গল্প শুনেছি, উত্তর দিল আলী।

তোমার বাবা কোথায়?

বাবা সমদ্রে বেরিয়েছে। কবে ফিরবে ঠিক নেই। মাস দুইয়ের আগে নয়।

বাবা তোমায় বলেছে, ডিক্সন কোন দ্বীপে গিয়েছিল?

আলী বলল, ঠিক কোন দ্বীপটায় বলেনি বাবা। সাহেবের বারণ ছিল বলতে। বাবা শুধু বলেছিল, মোরগ দ্বীপ থেকে সোজা পুবে, খানিক খোলা সমুদ্র পেরিয়ে ফের অনেকগুলো দ্বীপ। সেখানে কাছাকাছি একজোড়া দ্বীপ। তারই একটায় গিয়েছিল তারা।

দত্তদা ডনকে বললেন, বুঝেছ, মেসমন আইল্যান্ডস-এর কথা বলছে। জোড়া দ্বীপ এইখানেই হবে। মেস্‌মনের পশ্চিমে কয়েকটা দ্বীপ আছে, তারই একটা নিশ্চয়ই মোরগ। দ্বীপ।

তিনি ফের আলীকে বললেন, সাহেব কী করতে গিয়েছিল, সে-কথা কি বাবা বলেছে তোমাকে?

না।

সেই নৌকোর অন্য মাঝিরা কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন দত্তদা।

আলী বলল, সাহেব বাইরে থেকে নৌকা এনেছিল। কোত্থেকে জানি না। মাঝিদের চেনে না কেউ। একজন মাঝি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার জায়গায় বাবাকে নেয়। অসুস্থ মাঝিকে। ফেরত পাঠায়।

তুমি মোরগ দ্বীপ চেন? দত্তদার প্রশ্ন।

হ্যাঁ, চিনি।

আর জোড়া দ্বীপ? সেখানে গেছ কখনো?

না।

ঠিক আছে। তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে? মোরগ দ্বীপের পুবে যাব। ডিক্সন সাহেব যে দ্বীপে গিয়েছিলেন সেই দ্বীপটা খুঁজে বের করতে চাই।

বেশ, যাব।

আলী এককথায় রাজি।

.

মলুক্কা সাগর দিয়ে ভেসে চলেছে এক বড় নৌকো। মালয় ভাষায় একে বলে প্রাউ। আলীকে নিয়ে নৌকোয় মাঝি পাঁচজন। অন্য আরোহীরা হচ্ছে–ডক্টর দত্ত, ডন এবং তপন।

ক্রমে ওয়াইজিওর তটরেখা মিলিয়ে গেল। এবার কূলহীন সাগর। ফেনার মুকুট পরে ঢেউগুলি নাচতে নাচতে ছুটে চলেছে। আছড়ে পড়ছে নৌকোর গায়ে। একটানা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ কানে আসে।

ছইয়ের বাইরে এলে হু-হু বাতাস। লোনা জলের ছিটে লাগে গায়ে। মুকা গ্রাম ছাড়ার পর দু-দিন দু-রাত ওয়াইজিওর দক্ষিণ কূল ঘেঁষে চলেছিল তরী। মাঝে মাঝে থেমেছে কোনো দ্বীপে। বড় বিপজ্জনক যাত্রা। ডেম্পিয়ার প্রণালীর এই ধারটায় অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ, শিলাস্তূপ ও প্রবাল প্রাচীর। খাঁজ খাঁজ কাটা প্রবাল স্তূপে ধাক্কা খেলে ফুটো হয়ে যাবে। নোকোর কাঠ। তাই খুব সাবধানে এগোতে হয়েছে।

সর্দার মাঝি পোকো মাঝবয়সী, দীর্ঘকায়, কৃষ্ণবর্ণ। মাথায় ঘন কোঁকড়া কালো চল। পরনে লুঙ্গি ও কুর্তা।

প্রণালীটা পেরোবার সময় পোকো প্রায় সমস্তক্ষণ স্বয়ং হালের কাছে ছিল। খোলা সাগরে পৌঁছে সে হাঁপ ছাড়ল। কারণে অকারণে দাঁত বের করে তার কেবলই হাসি। পোকো জাতিতে পাপুয়ান। এরা খুব ফুর্তিবাজ।

দত্তদা চিনিয়ে দিচ্ছিলেন, তপন, প্রবাল দ্বীপ দেখ। ওই দেখ প্রবাল প্রাচীর। দ্বীপের ধারে ধারে জল থেকে মাথা তুলে আছে। কাটা কাটা গা, খাঁজ খাঁজ। ডেনজারাস। নৌকো

ঠোক্কর খেলেই চিত্তির। এর ভয়ে ডেম্পিয়ার প্রণালীর এই ধারটায় জাহাজ বা স্টিমার চলে না। এই দেশি নৌকোগুলোই কেবল দেখে দেখে বাঁচিয়ে চলতে পারে।

দু-চারটে ন্যাড়া শিলাস্তূপ ছাড়া সব দ্বীপই বন-জঙ্গলে ঠাসা। তীর ঘিরে সাগরজলে পা ডুবিয়ে রয়েছে ম্যানগ্রোভের ঘন বন।

মলুক্কা সাগরে ঢোকার মুখে একটা ছোট্ট দ্বীপ দেখিয়ে দত্তদা বললেন, ওই দেখ ভস্ক্যানিক আইল্যান্ড। এখন অবশ্য মৃত।

সমুদ্র থেকে খাড়া উঠেছে দ্বীপটা। পিরামিডের মতন দেখতে। মাথাটা ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। কয়েক শো ফুট উঁচু। পাহাড়ের গায়ে ঘন উদ্ভিদের আবরণ, দূর থেকে দেখাচ্ছে। কালচে-সবুজ।

পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত গেল। সাগরের গাঢ় নীল জল যেন আবির-রাঙা। কী অপূর্ব দৃশ্য! এরপর আকাশে একফালি চাঁদ এবং অজস্র তারা। ঢেউয়ের মাথায় নৌকাখানি দুলছে দুলছে।

ছইয়ের বাইরে পাটাতনে চিৎ হয়ে শুয়ে তপন চোখ মেলে ভাবে–জীবন কী বিচিত্র! মাত্র ছমাস আগে কলকাতায় গলির মোড়ে সেই সকাল-সন্ধে আড্ডা। মাঝে মাঝে ঠাকুরের দোকানের চা। দুপুরে ঘুম। টিউশনি। কখনো কখনো টাইপ-মেশিন খটখটিয়ে কিছু

রোজগার। চাকরি খোঁজা। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, টেস্ট-ক্রিকেট নিয়ে তুমুল তর্ক, উত্তেজনা। সদ্যমুক্ত কোনো হিট সিনেমার টিকিট জোগাড় করে ভারি গর্ব, মস্ত বীরত্ব। একঘেয়েমির অবসাদ কাটাতে ওই যা জুটত। আর এখন?

এমন জীবন কি সে কল্পনা করেছে কখনো? করেছে। বইয়ের পাতায় ছবি দেখে, কল্পনায় কত নতুন নতুন অজানা দেশে মন চলে গেছে। কিন্তু এখন বুঝছে কল্পনা আর বাস্তবে কী ভীষণ ফারাক! প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মিনিটে এ কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা! বদলে যাচ্ছে প্রকৃতি। বদলাচ্ছে শব্দ গন্ধ জীবজগৎ। স্নায়ু টান-টান। নতুনের স্বাদ নিতে উন্মুখ। যেন নেশা লাগে।

কলকাতার ছকে-বাঁধা জীবন, বহুদিনের চেনা মানুষ-জন বাড়িঘরের গণ্ডি কাটিয়ে কখনো বোঝেনি সে এই পৃথিবীটা কী বিশাল, কী অভিনব। কত কী দেখার আছে। দত্তদা ঠিকই বলেছিলেন, নেশা ধরে যায়। এই দশ দিনেই সে খুব টের পেয়েছে এর মর্ম।

অসীম জলরাশির বুকে মোচার ভোলার মতো এই আশ্রয়টুকু। বাতাস বাড়লে ঢেউ উত্তাল হয়। ভয়ে বুক কাঁপে। কিন্তু সে ভয় রোমাঞ্চকর, উত্তেজনায় ভরা। মন মুষড়ে পড়ে না, উল্লসিত হয়।

অনেক রাত অবধি তপন বাইরে শুয়ে শুয়ে জল ও বাতাসের মাতামাতি শুনল। কখনো উঠে বসে দেখল, সাগরজলে চাঁদের আলোর কাপন। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় শুভ্র ফেনার গতি, ফসফরাসের ঝিকিমিকি।

পরদিন উড়ুক্কু মাছ দেখল তপন। এই মাছের কথা বইয়ে পড়েছিল, ছবি দেখেছিল, নিজের চোখে দেখে বুঝল কী অদ্ভুত দৃশ্য। পারশে মাছের মতো আকার, চকচকে রুপোলি গা। খানিকক্ষণ তারা জল থেকে হাত তিনেক ওপর দিয়ে হাওয়ায় ভেসে চলল। পাক খেল বাতাসে। কখনো একটু ওপরে ওঠে, কখনো ফের নিচে নামে। ঠিক যেন পাখি। অন্তত শ-খানেক গজ এমনি ভেসে ভেসে গিয়ে মাছগুলো ফের ডুব দিল জলে। কে বলবে ওদের ডানা নেই!

কোত্থেকে একটা বড়সড় পাখি এসে বসল মাস্তুলের বাঁশে। হয়তো অনেক উড়ে উড়ে ক্লান্ত, তাই একটু জিরিয়ে নিতে চায়। একজন মাঝি টপ করে ধরে ফেলল পাখিটা। খানিক ছটফটিয়ে সে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। গায়ে তার চকচকে সবুজ আর তামাটে পালক। ল্যাজ ধবধবে সাদা। দত্তদা দেখে বললেন, এটা নিকোবর পিজিয়ন। খুব উড়তে পারে।

তপনের মায়া হল। ইঙ্গিতে মাঝিকে বোঝাল, ছেড়ে দাও। মাঝি তার কথা রাখল। মুক্তি পেয়ে তির বেগে উড়ে পালাল পাখিটা।

সর্দার মাঝি পোকো হাল ধরে দাঁড়িয়েছিল। সে উত্তেজিতভাবে কী জানি বলে উঠল। অমনি বাকি মাঝিরা ছুটে গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে। তাদের দৃষ্টি দূর সাগরের বুকে। ডন। বসেছিল বাইরে। সেও গেল। কী বলছে ওরা? মালয় ভাষা বোঝে না তপন। দত্তদা ছইয়ের ভিতরে বসে বই পড়ছিলেন। তপন তাকে বলল, ওরা কী দেখছে দত্তদা?

দত্তদা ওদের কথা একটু শুনে বললেন, তিমি। চলো দেখি।

দত্তদা চোখে দূরবিন লাগিয়ে তাকিয়ে থাকেন। ডন তপনকে বলল, লক্ষ কর, জলের ফোয়ারা উঠছে।

কোথায়? কত দূরে? অবশেষে দেখল তপন, অনেক দূরে দক্ষিণে। ছোট তোরণের মতো জলের বাঁকা ধারা। রোদ পড়ে চিকচিক করছে। কী আশ্চর্য চোখ ওদের! দত্তদার দূরবিনটা নিয়ে ভালো করে দেখল সে। পাঁচটা প্রকাণ্ড কালচে পিঠ ঢেউয়ের তালে তালে ভাসছে ডুবছে। যেন এক-একখানা মস্ত নৌকো উল্টো হয়ে ভেসে চলেছে। জলের ফোয়ারাটা সে দেখতে পেল স্পষ্ট। মোটা ধারায় অর্ধচন্দ্রাকারে পড়ছে। দত্তদা জানালেন, তিমি ডুব দিয়ে জলে ভেসে ওঠে গরম বাষ্পপূর্ণ নিঃশ্বাস ছাড়ে। সেই বাষ্প বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে এসে জলকণায় পরিণত হয়ে ফোয়ারার মতো পড়ে।

তিমিগুলো কাছে এল না। ক্রমে মিলিয়ে গেল দূরে।

দুপুরে উল্টো দিক থেকে এসে বড় বড় দুটো নৌকো পাশ কাটিয়ে চলে গেল। দু-দিকের যাত্রীরাই আগ্রহভরা চোখে তাকিয়ে রইল পরস্পরের পানে। ওদের একটা নৌকো থেকে একজন চিনা হাতে ঝুলিয়ে তুলে দেখাতে লাগল–কলার কাদি, নারকেল, কচ্ছপের খোলা, আরও কী কী। অর্থাৎ ব্যবসা করতে চায়। কিনতে চাইলে গায়ে ভেড়াবে তাদের। প্রাউ। আঙুল তুলে বোঝাতে চাইল জিনিসগুলোর দাম। তবে তাদের হতাশ হতে হল। পার। হয়ে মিলিয়ে গেল নৌকো দুটো। এই জলের রাজ্যে মানুষের দেখা পেলে ভারি আনন্দ হয়।

খানিক বাদে দেখা গেল সাগরের বুকে একটা কালো ফুটকি। আলী কী দেখাচ্ছে? দত্তদা জানালেন, মোরগ দ্বীপ এসে গেছে। ওখানে থামব আমরা। তারপর যাব পুবমুখো। ডিক্সন আইল্যান্ড আমি ঠিক খুঁজে বের করব। শুধু একটা ভাবনা–আমাদের আগেই যদি চ্যাং ওখানে হাজির হয়।

যদি হয় কী হবে? প্রশ্ন করল তপন।

ঝামেলা হবে। চ্যাং সোজা লোক নয়। উত্তর দিলেন দত্তদা।

.

সন্ধের ঠিক আগে মোরগ দ্বীপে পৌঁছল নৌকো।

ছোট্ট দ্বীপ। লম্বায় মাইলখানেকের বেশি নয়। জলের ধারে কোথাও ম্যানগ্রোভের বন, কোথাও খোলা বালুময় তট। পিছনে জঙ্গল। তীরে সুদীর্ঘ নারকেল গাছের সারি। একটা খাঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে নৌকোর নোঙর ফেলা হল। রাতে দত্তদা, তপন ও ডন রইল সমুদ্রতীরে তাঁবু ফেলে। মাঝিরা শুলো নৌকোয়। অন্ধকার হয়ে গিছল। দ্বীপের ভিতরে তখন তাই ঢোকা হল না। এখানে মাঝিরা খানিক জিরিয়ে নেবে। তাজা মাংস আর খাবার জল নেওয়া হবে সঙ্গে।

পরদিন সবাই দ্বীপ ঘুরতে বেরোল।

দত্তদার সঙ্গ ধরল তপন। সমুদ্রতট থেকে বেশি দূরে নয়, একটা ঝরনার উৎস থেকে গুবগুব করে জল বেরোচ্ছে ঠেলে। এছাড়া নাকি আর কোথাও এখানে খাওয়ার মতো মিষ্টি জল মেলে না। ওই জল ক্ষীণধারায় বয়ে গিয়ে বালিতে হারিয়ে যাচ্ছে।

জঙ্গলে ঢুকল তারা। বনের মাঝে পায়ের চলার পথ। সেই পথ ধরে এগোয়। কতরকম অজানা গাছ। মোটা মোটা লতা উঠেছে গাছ বেয়ে। মাথার উপর ডালপালা পাতার ঘন আচ্ছাদন। বড় গাছের তলায় ঝোঁপ-ঝাড় কম। তাই হাঁটতে অসুবিধা হয় না। তবে ছায়া-ছায়া স্যাঁতসেঁতে। নিস্তব্ধ বনভূমি। মাঝে মাঝে শুধু পাখির ডাক কানে আসে। কোনোটা সুরেলা শিস। কোনোটা তীক্ষ্ণ কর্কশ। দত্তদা মন দিয়ে শুনে বললেন, ওই চাচাছোলা ডাকটা টিয়াপাখির। রেড-লরি।

ঢং ঢং ঢং–গুরুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনির মতো পরপর কয়েকটা আওয়াজে চমকে উঠল তপন। বন যেন কেঁপে উঠল।

দত্তদা বললেন, নাট্‌মেগ পিজিয়নের ডাক। নাট্‌মেগ হচ্ছে জায়ফল। এই পায়রারা জায়ফলের দারুণ ভক্ত। ফলের শাঁসটুকু খেয়ে নিয়ে বীচি ফেলে দেয়। এরাই সাউথ-ইস্ট এশিয়ার দ্বীপে দ্বীপে জায়ফলের গাছ ছড়ায়। এ-দ্বীপেও নিশ্চয়ই জায়ফলের গাছ আছে।

একটা জলাভূমি। চারপাশে সাগু গাছ–সুপুরি গাছের মতো দেখতে। জলের ধারে এগোলেন না দত্তদা। বিষাক্ত সাপ থাকতে পারে। বললেন, এসব দ্বীপে বুনো বেড়াল, হরিণ বা বুনো শুয়োর ছাড়া বড় স্তন্যপায়ী জন্তু নেই।

বন একটু পাতলা হল। জমি ঢালু হয়ে উঠে গেছে টিলার মতন! তার গায়ে ঘন। বাঁশঝাড়। কী একটা প্রাণী উড়ে গেল এক গাছ থেকে আর এক গাছে। ঠিক যেন। কাঠবেড়ালী। হ্যাঁ, তাই বটে। দত্তদা বললেন, মলুক্কায় উড়ুকু কাঠবেড়ালী আছে। মোটা ল্যাজ ফুলিয়ে হাওয়ায় ভেসে লাফ দেয়। উড়ুকু অপোসামও আছে কোথাও কোথাও।

তপন আবিষ্কার করল, মাথার ওপর গাছের ডালে কী একটা অদ্ভুত প্রাণী। লম্বা ল্যাজ। ছোট্ট মাথা। মস্ত গোল গোল চোখ। ধবধবে সাদা লোমে ঢাকা গায়ে কালো কালো ছোপ। খুদে ভাল্লুক যেন। দত্তদা দেখে বললেন, কুস্‌কুস্‌। একরকম মারসুপিয়াল। মানে, যে

জন্তু পেটের তলায় থলিতে শাবক বহন করে। যেমন ক্যাঙারু। কুস্‌কুস্‌ ভারি কুঁড়ে প্রাণী। শুধু পাতা খায়।

মোরগ দ্বীপে মোরগ কই? জিজ্ঞেস করল তপন।

একসময় ছিল, এখন নেই। যারা দ্বীপে আসে, খাওয়ার লোভে মেরে শেষ করে দিয়েছে।

একবার বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। ডন হয়তো শিকার পেয়েছে। কিছুক্ষণ বাদে। আর একবার। ক

সাপ–লাফ দিয়ে ছিটকে গেল তপন।

কই? না! সাপ নয়। দত্তদা দেখালেন–ফার্ন গাছের পাতার তলা দিয়ে বেরিয়ে আছে এক সবুজ গিরগিটির লম্বা ল্যাজ।

কী অদ্ভুত জনহীন দ্বীপ। নির্জন ট্রপিকাল বনভূমি। তপন মুগ্ধ। এমন জগতে কোনোদিন পা দেবে কখনো সে ভাবেনি।

একজোড়া সবুজ রঙের পায়রা উড়ে গেল ঝটপট করে। কী সুন্দর সব প্রজাপতি। কোনোটা এক বিঘতের চেয়েও বড়। ছোট্ট মৌচুষি পাখি নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। দত্তদা

সাবধান করে দিলেন-দেখে চলে, বড় বড় মৌচাক আছে বনে। কাছে ঘেঁষলে আক্রমণ করবে।

আবার সমুদ্রতীরে ফিরল দুজনে।

ডন তিনটে নাটমেগ পিজিয়ন শিকার করেছে। বেশ বড় আকারের গোলা পায়রার মতো। তবে রং ঢের সুন্দর। মাঝিরা তির দিয়ে মেরেছে একটা ছোট হরিণ। মহা ফুর্তি তাদের। পাকা জংলি কলাও জোগাড় করেছে। স্বাদ একটু কষা কষা। কঁচা থাকলে এ-কলা ভাজা খাওয়া যায়। কয়েক কাদি নারকেল আর ডাব পাড়া হয়েছে। তপন ডাবের জল খেল প্রাণ ভরে। বাবুর্চি আলীর খাসা হাত। সে আজ বেজায় ব্যস্ত। দাউদাউ করে কাঠের উনুন জ্বলল। দুপুরে খাওয়াটা হল রীতিমতো ভোজ।

এক জায়গায় প্রবাল প্রাচীরে ঘেরা কিছুটা সমুদ্র। যেন এক ছোট্ট শান্ত হ্রদ। পাঁচিলের মাথায় মাথায় হেঁটে গিয়ে নিচে তাকাল তপন।

স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল। মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্যরশ্মিতে জলের ভিতরে রামধনুর বাহার। কত রঙের, কত বিচিত্র আকারের মাছ সাঁতার কেটে খেলে বেড়াচ্ছে। প্রবালকীট জমে জমে উঠেছে তলায়। যেন ডালপালা মেলা নানান আকৃতির ক্যাকটাস গাছ। কত রঙের নুড়িপাথর। ভেসে ভেসে দুলছে লম্বা লম্বা ঘন সবুজ জলজ উদ্ভিদ। ওই বুঝি পাতালপুরী, পরীর দেশ। আশা মিটিয়ে দেখল তপন। অ্যাকোয়ারিয়ামে অনেকটা এমনি সাজায়। তবে

তা সাজানো। আসলে নকলে আকাশ-পাতাল তফাত। এই দৃশ্য সে কখনো ভুলবে না। চোখ বুজে ভাবলেই ভেসে উঠবে মনে।

পরদিন নৌকো ছাড়ল। মোরগ দ্বীপ থেকে সোজা পুব মুখে। এখানে কাছাকাছি তিন-চারটে দ্বীপ আছে। এরপর মাইল পনেরো খোলা সমুদ্র। তারপর মেস্‌মন আইল্যান্ডস।

.

০৫.

মাইলখানেক এগিয়েছে নৌকো। পালে হাওয়া লেগে তরতর করে চলেছে। তপন দেখল, আলী একবার ছইয়ের ভিতরে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এসে কী জানি বলল পোকোকে। পোকো, ডন ও দত্তদার কাছে গিয়ে নিচু স্বরে কিছু বলল। ডনের ভুরু কুঁচকে গেল। তারা দুজনে উঠে ঢুকল ছইয়ে। বেরিয়ে এল খানিক বাদে। দুজনের মুখ থমথমে। তপন আর থাকতে পারল না। গুটিগুটি গিয়ে প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার দত্তদা?

দত্তদা বললেন, ব্যাপার মুশকিল। খাবার জল নেই। পড়ে গেছে। পিপের তলায় একটা চিড় খেয়েছে। সেখান দিয়ে সব জল চুঁইয়ে বেরিয়ে গেছে।

একটা বড় পিপেতে খাওয়া ও রান্নার জল থাকে। ছইয়ের কোণে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে পিপেটা। তপন দেখল, পিপের তলার দিকে কাঠে সামান্য ফাটা। চোখে দেখে চট করে বোঝা যায় না। সেখানটা ভিজে ভিজে। জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়েছে। পিপের তলায় ওই ছিদ্রটুকুর নিচে আর সামান্যই জল তখনো রয়েছে।

পোকো বলল, গতকাল পিপেটা পরিষ্কার করার জন্য নামানো হয়েছিল। তখন একবার হাত ফসকে আছড়ে পড়ে পাথরে। চিড় তখনই খেয়েছে। তারপর জল ভর্তি করে রাখা হয়। সারা রাতে একটু একটু করে জল বেরিয়ে গেছে। কেউ খেয়াল করেনি।

পিপের ফাটল আঠা দিয়ে বন্ধ করা হল। দত্তদা ভরসা দিলেন, ভাবনার কিছু নেই, সামনের দ্বীপ থেকে খাবার জল ভরে নেব। তবে সময় নষ্ট। জল খুঁজতে হবে। ভেবেছিলাম সোজা গিয়ে থামব মেস্‌মনে।

সাগরের বুকে একটা দ্বীপ দেখা গেল। নৌকো চলল সেই দিকে। ঘণ্টা দুই বাদে পোছল সেখানে। নিবিড় বনে ভরা ছোট্ট দ্বীপ। নৌকোর নোঙর পড়ল। আলী বাদে চারজন মাঝি বালতি হাতে নেমে পড়ল ডাঙায়। তারা অদৃশ্য হল গাছপালার ভিতরে।

তখনো পিপের তলায় প্রায় এক বালতি জল ছিল। তারই কিছুটা খরচ করে রান্না করল আলী। প্রায় দু-ঘণ্টা বাদে প্রথম ফিরল পোকো। ডাঙা থেকে হাত নেড়ে জানাল–জল।

পাওয়া যায়নি। আধঘণ্টার মধ্যে বাকি তিনজন মাঝিও ফিরল। তারাও এল শূন্য পাত্র নিয়ে।

দত্তদা বললেন, জল হয়তো আছে। ছোট ছোট গর্তে জমা বৃষ্টির জল। কিন্তু এ-বন ভেদ করে তা খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন কাজ। এসব দ্বীপের মাটির পাথর প্রায়ই এমন হয় যে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। ওপরে জমতে পায় না।

দুপুরে খাওয়া হল। বাকি জল থেকে ভাগ করে খেল সবাই। সন্ধের সময় জোয়ার। আসতে ফের নৌকো ছাড়ল। পোকো বলল, সামনে পুবে আর একটা দ্বীপ আছে। বেশ বড় দ্বীপ। ওখানে ঠিক জল মিলবে।

হঠাৎ বাতাস একেবারে পড়ে গেল। পাল চুপসে গেছে। নৌকো এগুচ্ছে অতি ধীরে। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে সামনে দিগন্তরেখায় কালো পাহাড়ের মতন এক দ্বীপ। কিন্তু ওটা আর কাছে এগিয়ে আসছে না কেন? বেগতিক বুঝে মাঝিরা দাঁড় হাতে নিল। ঝপাঝপ দাঁড় বাইতে শুরু করল। নৌকো এগোয়। আর সিকি মাইলও নেই। সহসা মাঝিরা চিৎকার করে উঠল। খোলের ভিতরে ছিল তপন, দত্তদা ও ডন। পোকোর গলা শুনে তারা সবাই বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

কী হয়েছে পোকো?

সর্বনাশ হয়েছে, বলল, আমরা চোরাস্রোতে পড়েছি। দ্বীপ থেকে সরে যাচ্ছি।

মাঝিরা পাগলের মতো দাঁড় বাইছে। পোকো ঝুঁকে পড়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে হালের চাকা। তবু শেষ রক্ষা হল না। দেখতে দেখতে দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে যেতে লাগল নৌকো। ক্রমে ছাড়িয়ে গেল দ্বীপ।

কাতর আর্তনাদ করে দাঁড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাঝিরা লুটিয়ে পড়ল পাটাতনে। বাকিরা স্তব্ধ। হতাশ চোখে চেয়ে আছে পিছনে ফেলে আসা দ্বীপটার দিকে। দত্তদা শুধু একবার বলে উঠলেন, সাবধান, মেস্‌মনে পৌঁছনো চাই তাড়াতাড়ি, নইলে বিপদ।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অনুকূল বাতাস দিল। স্রোত গেল ঘুরে। নৌকো চলতে লাগল ঠিক পথে, সামান্য উত্তরমুখো হয়ে পুবে। লক্ষ্য–মেসমন আইল্যান্ডস।

মাঝিদের অবস্থা শোচনীয়। প্রচণ্ড পরিশ্রমে শ্রান্ত ঘর্মাক্ত। জলের অভাবে শরীর টলছে। কেবল ঠোঁট চাটছে, হাঁপাচ্ছে।

পিপের তলায় কয়েক মগ জল বাকি। সেইটুকু ভাগ করে দেওয়া হল সবার মধ্যে। মাঝিরা একটু বেশি জল খেল। ভাগ্য প্রসন্ন হলে কাল দুপুরের আগেই মেস্‌মন দ্বীপপুঞ্জের দেখা পাওয়া উচিত।

সূর্য উঠল। বেলা আটটা না বাজতেই ট্রপিকাল গ্রীষ্মের রোদের কী তেজ! আরও এক ঘণ্টা কাটল। বড় কষ্ট হচ্ছে তপনের। জিভটা শুকিয়ে ফুলে উঠেছে। গলা দিয়ে স্বর বেরোতে চায় না। তেষ্টায় যেন ছাতি ফেটে যাবে। চারপাশে এত জল। অকূল পাথার জলের ভাণ্ডার। তবু তৃষ্ণা নিবারণের উপায় নেই। তপন ভাবে, আচ্ছা কখনো কখনো কতক্ষণই তো জল না খেয়ে কাটাই। তেষ্টায় এত কাতর হই না। এখন কেন এত কষ্ট? জল নেই। চাইলে পাব না এই সত্যটাই বুঝি অভাবকে এত তীব্র করে তুলেছে। কিছুকে পাওয়া যাবে না। জানলেই তার প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষা বেশি তীব্র হয়। মরুভূমিতে তৃষ্ণার কবলে যারা পড়ে তাদেরও এমনি কষ্ট হয়? বোধহয় না। এই জলের রাজ্যে বসে তেষ্টার জল না পাওয়া আরও কষ্টকর।

তপনের মাথা ঝিমঝিম করছে। বারো ঘণ্টার ওপর সে প্রায় কিছুই খায়নি। অন্যরাও কেউ খায়নি ভয়ে। কারণ খেলে গলা আরও শুকিয়ে যাবে। তেষ্টা বাড়বে। সকালে টিন খুলে টোমাটো-সস দিয়েছিল ডন। সেই সামান্য খেয়েছে। দুটো নারকেল ছিল। মাঝিরা খেয়েছে তার জল ও শাঁস।

ওয়াইজিও ছাড়িয়ে পথে দুদিন বৃষ্টি হয়েছিল। নৌকোয় বসে তখন কী বিরক্তিকরই না লেগেছিল! আহা এখন যদি বৃষ্টি নামে। নাঃ, কোনো আশা নেই। নির্মেঘ আকাশ।

আলী ছিল হালে। চেঁচিয়ে উঠল, পুলো, পুলো!

মালয় ভাষায় পুলো মানে দ্বীপ। সকলে দেখল সাগরের বুকে জেগে উঠেছে একটা কালো বিন্দু। বড় জোর মাইল তিন দূরে।

কী আশ্চর্য! অমনি শরীরের জ্বালা কমে গেল তপনের। আর ভয় কী!

দ্বীপটা থেকে মাইলখানেক দূরে, হঠাৎ দমকা হাওয়ার ঝাঁপটা লাগতে লাগল নৌকোর গায়ে। ফুলে ওঠা পালের কাপড় বেঁকে যাচ্ছে। নৌকো সরে যাচ্ছে ডাইনে!

হে ভগবান, হে আল্লা বাঁচাও–চিৎকার করে উঠল মাঝিরা। এই দ্বীপ ফসকালে যে আর নিস্তার নেই। তিলে তিলে অতি নিষ্ঠুর পরিণতি।

পোকো চটপট পালের কাপড়গুলো সামান্য বাঁকিয়ে কী সব কারিকুরি করল। চার মাঝি হাতে তুলে নিল দাঁড়। প্রাণপণে নৌকোর গতি ঘোরাতে চেষ্টা করে।

বেচারা মাঝিরা। বারবার ঠোঁট চাটছে। সেই কখন একটু জল খেয়েছে। শরীরে শক্তি আর বুঝি কিছু অবশিষ্ট নেই। তপন ফের বুকের ভিতর শুকনো জালাটা টের পায়।

ডন ঢুকে গেল ছইয়ের ভিতর। বেরিয়ে এল হাতে একটা ওয়াটার-বটল। তপনের কাছে এসে বলল, এক ঢোক খাও। বোঝা গেল এই শেষ সম্বলটুকু সে বাঁচিয়ে রেখেছিল চরম দুঃসময়ের জন্য।

মাত্র এক ঢোক গলা দিয়ে নামতেই দেহ যেন জুড়িয়ে গেল তপনের। প্রাণ আরও চায় কিন্তু উপায় নেই।

ডন এবার দাঁড়াল দত্তদার সামনে। দত্তদা ইশারায় বোঝালেন, আগে মাঝিদের দাও। মাঝিরাও এক ঢোক করে পেল। আলী আরও চায়। তার চোখে কাতর অনুরোধ। ওকে দিতে হল আর-একটু। ডন কিন্তু নিজে খেল না। দত্তদাও না। অর্থাৎ ফুরিয়ে গেছে জল। বড় লজ্জা হল তপনের। ডন ও দত্তদা নির্বিকার।

ওইটক জল যেন নতুন জীবন দিল। ঝপাঝপ দাঁড় পড়ছে। দ্বীপ কাছে এগিয়ে আসছে। শ-দুই হাত এমনি যাওয়ার পর পোকো বলল, ব্যস, দাঁড় থামাও। আর খেটে দরকার নেই। ভরা পালই নৌকোকে নিয়ে যাবে ঠিক জায়গায়।

.

০৬.

নৌকো স্পর্শ করল মেস্‌মন আইল্যান্ডস-এর পশ্চিম প্রান্তের একটি দ্বীপ। সমুদ্রগর্ভের কোনো পাহাড়ের চূড়া জলের বাইরে দ্বীপ হয়ে জেগে আছে। চার-পাঁচশো ফুট উঠেছে। অন্তত। পাহাড়ের গায়ে উদ্ভিদের আবরণ।

দত্তদা বললেন, মাঝিরা বিশ্রাম করুক। এবার আমরা বেরব জল খুঁজতে।

পোকো কিন্তু ছাড়ল না। সেও সঙ্গে চলল। দত্তদা তপনকে বললেন, তুমি নৌকো থেকে দূরে যেও না। কাছাকাছি খোঁজো। না হয় আমার সঙ্গে চলো।

তপন একাই খুঁজতে চাইল।

জলের ধারে ধারে খানিক চক্কর দিল তপন। ঝরনা, নদী বা জমে থাকা বৃষ্টির জলের কোনো চিহ্ন নেই। সে পাহাড়ে উঠতে লাগল।

পাহাড়ের গায়ে ছোট-বড় গাছ-ক্যাসুয়ারিনা, ধ্রু-পাইন, মানুষ-সমান উঁচু ফার্ন। একজাতীয় ডুমুর গাছ। লালচে মাটি ধুয়ে বেরিয়ে পড়েছে খোঁচা খোঁচা পাথর। বার কয়েক তপন হোঁচট খেল। নেহাৎ পুরু চামড়ার জুতো ছিল পায়ে, তাই পা কাটেনি। অনেক পাখি। চোখে পড়ছে। কাঠবেড়ালী, বুনো শুয়োরও দেখল। এরা জল খায় কোত্থেকে?

প্রায় নাকের ডগায় লাফ দিয়ে পড়ল একটা প্রকাণ্ড বীভৎস দেখতে মাকড়শা। ছিটকে পিছিয়ে এল তপন। সে শুনেছে, এমনি মাকড়শার কামড়ে ভীষণ বিষ।

উঠতে উঠতে বুকে হাঁপ ধরে। মাটিতে বসে জিরোয় তপন। এবার নামা যাক। আমি ব্যর্থ হলাম, তবে অন্যদের অভিজ্ঞ চোখ ঠিক আবিষ্কার করবে তাদের তৃষ্ণার জল।

নামতে নামতে তপন থমকে দাঁড়াল। একটা গুহা-মুখ যেন? ভিতরটা অন্ধকার। কৌতূহলী হয়ে সে উঁকি দিল। কতটা লম্বা বোঝা গেল না। পিঠের হ্যাঁভারস্যাক খুলে বের করল টর্চ। আলো ফেলে মনে হল গুহাটা বেশ গভীর। আলো শেষ অবধি পৌঁছচ্ছে না। কেমন বোটকা গন্ধ। মেঝেয় আলো ফেলে দেখল, মাটিতে জলের দাগ। দতদা Iশিখিয়েছিলেন যে, জল বয়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখলে অনুসরণ করবে। ঝরনার উৎস বা বটিস জমা জল খুঁজে পেতে পারো।

গুহাটা নিচ দিকে গড়ানো। ভিতরে ঢুকুল তপন। যদি বুনো জানোয়ার বা সাপ থাকে? এখানে হিংস্র জন্তু নেই শুনেছে। তবে বিষাক্ত সাপ থাকতে পারে বইকি! কোমরে ঝোলানো মোটা বেঁটে বেতের লাঠিটা এক হাতে, অন্য হাতে টর্চ জ্বেলে তপন পা টিপে চিপে এগোল জলের ধারার চিহ্ন অনুসরণ করে।

বিকট বোঁটকা গন্ধটা তীব্র হল। মাথার ওপর কীসের নড়াচড়া? ছাদে আলো ফেলে। তপন চমকে গেল। সারি সারি বাদুড় ঝুলছে উল্টো মুখে। আঁধারের জীব। আলোর আবির্ভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যাক, বাদুড়কে ভয় করার কিছু নেই। এগোল তপন।

বারবার টর্চের জোরাল আলো পড়তে কিছু বাদুড় উড়তে শুরু করল। তারা বাইরে দিনের আলো গেল না। গুহার মধ্যেই পাক খেতে থাকে। স্যাঁৎ স্যাঁৎ করে কাটিয়ে যায় তপনকে। মাঝে মাঝে উড়ন্ত জীবগুলোর ডানার শীতল ছোঁয়া লাগে। গা শিরশির করে ওঠে। আর এগোতে ভরসা পায় না তপন। ডাইনে দরজার মতো একটা ফাটল। গুহার শাখা। তার ভিতরে সে পা বাড়ায়। একঝাঁক বাদুড় ভেসে আসে অন্ধকার ভেদ করে।

তাদের এড়াতে গিয়ে তপন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। গড়াতে গড়াতে নেমে চলল পাথুরে ঢালু জমি বেয়ে। তারপর আছড়ে চিৎপাত হয়ে পড়ল কঠিন ভূমিতে।

বোধহয় চার-পাঁচ সেকেন্ড সম্বিত ছিল না তপনের। হুঁশ হতে উঠে বসল। দেহে কয়েক জায়গায় দারুণ ব্যথা। টর্চটা হাত ফসকে গেছে। হাতড়ে হাতড়ে সে টর্চ খোঁজে। ভিজে ভিজে জমি। তারপরই শিহরণ। জল! কনকনে ঠাণ্ডা জলে হাত পড়েছে। আঁজলা করে একটু জল নিয়ে তপন মুখে দিল। আঃ কী চমৎকার! গলা জিভ জুড়িয়ে গেল। পেট ভরে সে জল খেল। চোখে-মুখে জলের ঝাঁপটা দিল। হাত দিয়ে অনুভব করল একটা জলের কুণ্ড। এগোতে আর সাহস হল না। কত গভীর কুণ্ড কে জানে! ওপরে তাকাল। ক্ষীণ আলোর রেখা ফাটলের মুখে প্রায় হাত কুড়ি ওপরে। চোখ একটু সয়ে যেতে অন্ধকার একটু ফিকে ঠেকল। ওয়াটার বটলটায় জল ভরল। তারপর দেয়াল আঁকড়ে আঁকড়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করে। ঢালুর ধারে অনেক খাজ খাঁজ, তাই ওঠাটা তেমন শক্ত হল না। বাইরে গিয়ে সে সোজা নেমে গেল নৌকোর কাছে। দত্তদারা তখনো ফেরেনি।

নৌকো থেকে ডনের বন্দুকটা নিয়ে তপন দুবার ফায়ার করল। এটা সংকেত। সবাইকে ফিরে আসতে ডাকা হচ্ছে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছল ডন। তপনকে দেখে বলল, কী ব্যাপার, পড়ে গিছলে। নাকি? তোমার কপালটা ফোলা কেন?

ওসবে ভ্রূক্ষেপ নেই তপনের। জিজ্ঞেস করল, জল পেয়েছ?

না। হতাশভাবে ঘাড় নাড়ল ডন।

আমি পেয়েছি। তপন সংক্ষেপে জানাল গুহার বিবরণ।

কই দেখি?

জলের বোতলটা হাতে পেতেই ডন ঢকঢক করে অনেকখানি জল খেল। বোঝা গেল কতখানি তেষ্টা চাপা ছিল তার বুকে।

মিনিট পাঁচেক বাদে এলেন দত্তদা। ডন জিজ্ঞেস করল তাকে–জল পেয়েছেন?

না।

আমিও পাইনি। কিন্তু তপন পেয়েছে। চমৎকার জল।

সাব্বাস! সব শুনে দত্তদা তপনের পিঠ চাপড়ে দিলেন। তিনিও জল খেলেন তৃপ্তি ভরে। ডনকে নিয়ে ছুটলেন আরও জল আনতে। তপনের কাছে জেনে নিলেন গুহাটার হদিশ। তপনকে সঙ্গে যেতে দিলেন না। বললেন, তুমি রেস্ট নাও।

আমার টর্চটা আনবেন। মনে করিয়ে দিল তপন।

পোকোও ফিরল। সে একটা গর্তে জমা জল পেয়েছে। তবে খুবই সামান্য। জল নিশ্চয়। আরও জায়গায় আছে। তবে খুঁজতে সময় লাগবে।

ঠাণ্ডা স্বাদু জল পান করে সবাই ফের তাজা হয়ে উঠল। আলী মেতে উঠল বানার তোড়জোড়ে। জালে পড়ল একঝাক অতি সুস্বাদু চাদা মাছ। তোফা ভাজা হবে। মানিক। পাহাড়ের গায়ে পাথরের খাঁজে পেল একগাদা পায়রার ডিম। টগবগিয়ে ভাত ফোটে। রাক্ষসের মতো খেল সবাই। খেয়েই গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। ব্যস, ঘুম।

রাতটা সেখানেই কাটল। ভোর রাতে ফের যাত্রা শুরু হল।

.

মাইল দেড়েক এগিয়েছে নৌকো। জলের বুকে দেখা গেল দু-তিনটে কালো কালো বিন্দু। দত্তদা দূরবিন দিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, ডুবো পাহাড়ের চুড়ো। আরে ওটা কী! নড়ছে। এ যে মানুষ! একটা পাথরের মাথায়। ডাকছে আমাদের হাত নেড়ে। আরে কী আশ্চর্য, এ যে জিয়ান! চালাও চালাও নৌকো ওইখানে–

তপনদের নৌকো কাছে যেতেই স্পষ্ট দেখা গেল–হাত তিরিশ উঁচু গম্বুজের মতো একখণ্ড নেড়া পাথর জলের বাইরে খাড়া হয়ে আছে, তার মাথায় গিরগিটির মতন লেপটে রয়েছে জিয়ান। নৌকো লক্ষ্য করে প্রাণপণে হাত নাড়ছে।

জিয়ানের কাছ অবধি নৌকো এগোল না। ওই গম্বুজের আশেপাশে আরও ডুবো পাহাড়। কোনোটার ডগা দেখা যাচ্ছে, কোনোটা বা জলের তলায়। জায়গায় জায়গায় জল। ঘুরছে, বুজকুড়ি কাটছে ফেনা। বোঝা যায় স্রোত বাধা পাচ্ছে। শুশুকের শিরদাঁড়ার মতো কোথাও জলের ওপরে কালো পাথরের রেখা। একগাছি মোটা দড়ি ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল। পোকো। একটা ছোট স্কুপের গায়ে জড়িয়ে গেল দড়ির ফঁস। থেমে গেল তরী।

জিয়ান হাত তিরিশ দুরে। ওকে ইশারা করা হল–ঝাঁপিয়ে পড়ো। সাঁতরে এসো।

জিয়ান একটু ইতস্তত করে লাফিয়ে পড়ল জলে।

কিন্তু আধাআধি পেরোবার আগেই জিয়ান শ্রান্ত হয়ে পড়ল। হাবুডুবু খাচ্ছে। ক্রমেই ভেসে যাচ্ছে দূরে।

ও পারছে না। ডুবে যাবে, বললেন দত্তদা। তিনি ছুটে গিয়ে এক বান্ডিল দড়ি বের করে আনলেন। সরু লম্বা নাইলনের দড়ি। চটপট খুলতে লাগলেন নিজের পোশাক। বোঝা গেল জিয়ানকে বাঁচাতে তিনি স্বয়ং জলে ঝাপাতে চান।

আপনি থাকুন, বাধা দিল পোকো, আব্দুর, সে চেঁচিয়ে ডাকল।

তৎক্ষণাৎ আব্দুর মাঝি দড়ির এক প্রান্ত কোমরে বেঁধে লাফিয়ে পড়ল জলে। দড়ির অন্য ধার রইল পোকোর হাতে।

মাছের মতো জল কেটে চলল আব্দুর। মিনিট দশেকের মধ্যেই সে ধরে ফেলল জিয়ানকে। জিয়ান দু-মুঠোয় চেপে ধরল দড়ি। নৌকো থেকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনা হল দড়ি। নৌকোয় টেনে তোলা হল দুজনকে। হাঁপাতে হাঁপাতে জিয়ান চেতনা হারিয়ে ঢলে পড়ল।

খানিক শুশ্রূষার পর সুস্থ হয়ে উঠলে জিয়ানকে সকলে মিলে প্রশ্ন শুরু করল। ওখানে কেন? কীভাবে?

জিয়ান যা উত্তর দিল তা মোটামুটি এই–

চ্যাং-এর সঙ্গে যাচ্ছিল জিয়ান ডিক্সন দ্বীপের খোঁজে। চ্যাং একজন শাগরেদ এনেছে। নাম তার কিচিল। মালয় ভাষায় কিচিল মানে খুদে। লোকটা কিন্তু বিরাট লম্বা-চওড়া এবং গুণ্ডা প্রকৃতির। যে দ্বীপে পাখির চামড়াটা জিপসিদের কাছ থেকে কেনা হয়েছিল সেখানে তারা থামে। তারপর জিপসিদের নির্দেশমতো নৌকো চালায়। এই জায়গা দিয়ে যখন যাচ্ছিল জিয়ানরা তখন সন্ধেবেলা। ছইয়ের গা ঘেঁষে বাইরে বসেছিল জিয়ান। ভিতরে ছিল। চাং ও কিচিল। তাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল জিয়ান। এটা সেটা কথার পর কিচি বলে ওঠে- পাখি পাব তো?

মনে তো হয়। চ্যাং জবাব দেয়।

যদি না পাই?

তাহলে মুশকিল। প্রিন্সের কাছে ধ্যাতানি খেতে হবে। এত খরচপত্তর দিয়েছে। তবে মনে হয় জিয়ানের খবর ঠিক।

ওঃ, পেলে কিন্তু দারুণ দাঁও। প্রিন্স আমাদের লক্ষপতি করে দেবে বলেছে। আচ্ছা জিয়ানকে কত দেবে? মানে যদি পাখি পাওয়া যায়?

খিকখিক করে চ্যাং-এর হাসি শোনা যায় এবং বলে, জিয়ান? ফুঃ! একটি পয়সাও নয়। ওর ভাগটা আমরা নেব।

না দিলে ছাড়বে কেন? কষ্ট করে নিয়ে এল পথ দেখিয়ে, বলল কিচিল।

নেবার জন্যে ও বেটা তখন থাকলে তো?

মানে?

মানে ওটাকে আগেই সাবড়ে দেব। নতুন জাতের প্যারাডাইস বার্ড-এর ঠিকানা প্রিন্স আর আমরা দুজন ছাড়া আর কারও জানা থাকবে না। এই জন্যেই মাঝিগুলোকে এনেছি দূর থেকে। ওরা এ-পথে আসে না। ওরা বুঝতেও পারবে না পাখিগুলোর দাম কতখানি। তাছাড়া ভয় দেখিয়ে, টাকা দিয়ে ওদের মুখ বন্ধ করে দেব-খবরদার কাউকে বলবে না যে এখানে প্যারাডাইস বার্ড পাওয়া গেছে।

জিয়ানকে মারবে কেন? ওর মুখও যদি বন্ধ করা যায়?

এখন বন্ধ করা যাবে। কিন্তু পরে যদি বেটা ফাঁস করে দেয়। প্রিন্সের বেইজ্জত হবে। না না ওকে রাখা চলবে না। শেষে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

মাঝিরা যদি বলে ফেলে পরে?

ওরা কাকেই বা বলবে? কিন্তু জিয়ান হয়তো বলে দেবে ব্যাংককের সেই প্রফেসরকে।

ওকে শেষ করবে কখন? জিজ্ঞেস করে কিচিল।

চ্যাং বলে ওঠে, এখনই করা যায়। মাথায় মোক্ষম এক ঘা মেরে নৌকো থেকে দেব ফেলে। তবে মাঝিরা যেন টের না পায়। ভড়কে যাবে। ঝামেলা করবে। থাক বরং সামনের দ্বীপে যেখানে থামব, সেখানেই ডাঙায় নেমে ওকে লুকিয়ে খতম করে ফেলে দেব জলে। ওকে আর আমাদের দরকার কী?

চ্যাং-এর এই কথা শুনে জিয়ানের দারুণ ভয় হয়। উঃ, কী শয়তান! আর অপেক্ষা করতে তার সাহস হয়নি। অন্ধকারেই সটান লাফিয়ে পড়েছিল জলে। ইচ্ছে ছিল কাছের দ্বীপটায় গিয়ে উঠবে। কিন্তু পারেনি। স্রোতের টানে যখন সে ক্রমে দূরে ভেসে যেতে থাকে, তখন কাছে পেয়ে আঁকড়ে ধরেছিল এই ডুবো পাহাড়ের গা। তারপর প্রাণের তাগিদে কী করে যে এর ডগায় চড়ে বসল তা সে নিজেই জানে না। এক দিন, এক রাত, সে ওই পাথরটার ওপর বসেছিল। জোয়ারের জল উঠেছিল পায়ের নিচে তিন-চার হাতের মধ্যে। ভাগ্যিস ঝড়-তুফান আসেনি!

প্রিন্স এই আবিষ্কারটা নিজের নামে চালাতে চায় বুঝি? দত্তদা জিজ্ঞেস করলেন।

হুঁ। ঘাড় নাড়ল জিয়ান।

দত্তদার মুখে একটা তিক্ত হাসি ফুটে ওঠে। তিনি ডনের সঙ্গে একবার অর্থপূর্ণ ভাবে চোখাচোখি করলেন। ভাবখানা যেন, ঠিক যা ভেবেছি।

চ্যাং টের পেয়েছিল তোমার পালানো? জানতে চাইলেন দত্তদা।

হ্যাঁ, জলে শব্দ হতেই বেরিয়ে এসেছিল। মাঝিরা আমায় বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু চ্যাং বারণ করে থামিয়ে দেয়। আমি যে ইচ্ছে করে ঝাঁপিয়েছি হয়তো তা বোঝেনি। ভেবেছিল, আপদ গেল, বেকায়দায় পড়ে গেছি জলে।

জিয়ান মাথা নিচু করে বলল, লোভে পড়ে আপনাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম, সেই পাপেরই ফল।

চ্যাং কোন দিকে গেছে? দত্তদার প্রশ্ন।

ওই দিকে, হাত তুলে দেখাল জিয়ান, ওই দিকটাই দেখিয়েছিল জিপসিরা।

আবার তপনদের নৌকো ছাড়ল। চ্যাংদের অনুসরণ করে যাত্রা শুরু হল।

মিনিট পনেরো কেটেছে, সহসা কানে এল একটা গুমগুম শব্দ। আওয়াজটা ক্রমেই বাড়তে লাগল। যেন একটা ভারী ট্রেন গড়িয়ে আসছে। ঝড় আসছে নাকি? পোকো চটপট পাল নামিয়ে ফেলল। না, ঝড় নয়। পিছনে অনেক দূরে দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। অন্তত সিকি মাইল বিস্তার, মাথায় ফেনার রেখা, ফেঁপে ওঠা বিশাল জলস্রোত হু-হুঁ করে ধেয়ে আসছে। দেখতে দেখতে সেই জলোচ্ছ্বাস ভয়ঙ্কর গর্জনে একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। গঙ্গায় কোটালের বানে এমনি ধেয়ে আসা ঢেউ, এমনি জলের গর্জানি দেখেছে। তপন। তবে এ আরও বিরাট, আরও প্রচণ্ড ব্যাপার।

শুয়ে পড়ুন। ধরে থাকুন নৌকো, চেঁচিয়ে উঠল পোকো। তার কথা শেষ হতে না হতেই নৌকোটা যেন সোজা লাফ দিয়ে উঠল শূন্যে। পলকের জন্য ঢেউয়ের মাথায় চড়ে বসেই তলিয়ে গেল নিচে। তবে ডুবল না। প্রধান ঢেউটা পেরিয়ে যাওয়ার পর সমুদ্র টগবগ করছিল। নৌকো থরথর করে কাঁপছিল, দুলছিল, নাচছিল। সবাই শক্ত মুঠোয় কাঠ বাশ আঁকড়ে ধরেছিল, নইলে ছিটকে পড়ত জলে।

মিনিট দশেকের মধ্যে সমুদ্র শান্ত হয়ে গেল। ডন বলল–ভূমিকম্প। তারই ফল। এখানে সমুদ্রগর্ভে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়।

দত্তদা জিয়ানকে বললেন, ওই পাথরটার ওপরে থাকলে কী অবস্থা হত বুঝেছ?

জিয়ান শিউরে উঠল। সবাই দেখেছিল, ফণা তুলে ধেয়ে আসা তরঙ্গটি জিয়ানের আশ্রয়স্থল ডুবো পাহাড়টার মাথাটাকে কেমন সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছিল। ওখানে থাকলে জিয়ান নির্ঘাত মরত।

একটু বাদেই ফের গুমগুম আওয়াজ। আবার সেই রকম তরঙ্গের আবির্ভাব। আবার সেই নাকানি-চোবানি। পরপর আটটি ঢেউ এল ছুটে, ঘণ্টাখানেকের ভিতরে।

নৌকোয় যাত্রীরা সবাই অল্পবিস্তর আঘাত পেল। জিনিসপত্র ছত্রাকার। কিছু ভেঙেও ছিল। ঢেউয়ের দোলায় নৌকো কিন্তু মোটেই এগোয়নি। প্রায় একই জায়গায় ছিল।

.

০৭.

বিকেলে নৌকো নোঙর ফেলল এক দ্বীপে। জোড়া দ্বীপ এখনো নজরে আসেনি। দত্তদা বললেন, এখন খানিক বিশ্রাম। এখানে ঝরনা আছে, এটা মস্ত সুবিধে। কাল সকালে ফের রওনা হব।

একজন মাঝি দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, আসাপ! আসাপ!

মালয় ভাষায় আসা মানে ধোঁয়া। কোথায়? দ্বীপের অন্য ধারে গিয়েছিল লোকটি। সেখান থেকে দেখেছে–দূর সাগরের বুকে ধোঁয়া।

সবাই গেল সেই ধারে। কিছু দূরে এক পাহাড়ি দ্বীপ। তার ওপর ধোঁয়া জমেছে। কারখানার চিমনি দিয়ে যেমন ধোঁয়া বেরোয়, তেমনি দ্বীপের পাহাড়ের নেড়া চুড়োটা থেকে ধোঁয়ার রাশি আকাশে উঠে জমাট বাঁধছে–ছাতার মতো দেখতে যেন একখণ্ড গাঢ় কালো মেঘ।

পোকো বলল, আপি পুলো। অর্থাৎ আগুনে দ্বীপ।

আলী চমকে উঠে বলল, বাবা বলেছিল, পাশাপাশি দুটো দ্বীপের একটা আগুনে দ্বীপ। তবে এখন ঠাণ্ডা। মানে জোড়া দ্বীপের একটা, যেখানে গিয়েছিল বাবা ডিক্সন সাহেবের সঙ্গে।

দত্তদা দূরবিনে দেখে বললেন, জোড়া দ্বীপ তো কই দেখছি না। এই অঞ্চলে এমনি অ্যাকটিভ ভলক্যানো কিছু আছে। অনবরত ধোঁয়া বেরোয়। কখনো কখনো বিস্ফোরণও হয়।

পোকো বলল, ধোঁয়া বেরোয় এমন দ্বীপ এখানে আছে কই শুনিনি? হয়তো অল্প কিছু দিন হল বেরোচ্ছে।

পরদিন দত্তদা বললেন, আমি ওই আগ্নেয় দ্বীপটা থেকে একবার ঘুরে আসি। দেখতে চাই ওটার আড়ালে কোনো দ্বীপ আছে কিনা। ওখানেই কি ডিক্সন আইল্যান্ড? বিকেলের আগেই ফিরে আসব। মাইল তিনেকের বেশি তো দূর নয়।

তপন বলল, বেশ, সবাই মিলে যাই।

দত্তদা বললেন, না। এখুনি ওই দ্বীপে সবাই হাজির হওয়া ঠিক হবে না। দ্বীপটার অবস্থা সুবিধের নয়। যা ধোঁয়া বেরুচ্ছে! আমি শুধু পোকো, আলী এবং আর একজন মাঝিকে নিয়ে যাব। অন্যরা এখানে বিশ্রাম নিক।

ডন বলল, আমিও যাব।

দত্তদা বললেন, কোনো দরকার নেই।

ডন বলল, ধরুন ওটাই ডিক্সন আইল্যান্ড। এবং চ্যাং ইতিমধ্যে ওখানে আড্ডা গেড়েছে। তখন? অমি তাই সঙ্গে যেতে চাই।

হতে পারে, বললেন দত্তদা, তোমাকে এখন সঙ্গে নেব না। তোমার আঙুলে জখম। রেস্ট দরকার। চ্যাং থাকলে আমি গোঁয়ারের মতো ওদের মুখোমুখি হব না নিশ্চয়ই। লুকিয়ে পালিয়ে আসব। তারপর পন্থা স্থির করা যাবে, কীভাবে ওদের উৎখাত করব। তখন তোমার সাহায্য লাগবে বইকি!

দত্তদা একাই নৌকো আর কয়েকজন মাঝিকে নিয়ে সেই ধূমায়িত দ্বীপের উদ্দেশে রওনা হলেন।

সেদিন বিকেল গেল। সন্ধে গেল। রাত্রি নামল। দত্তদারা কিন্তু ফিরলেন না।

সমুদ্রতীরে অপেক্ষা করে ডন ও তপন। তাদের দৃষ্টি জলের দিকে। এখনও কেন ফিরলেন না দত্তদা! দুপুরে ঝোড়ো হাওয়া বয়েছিল খানিকক্ষণ। তাতে কি নৌকো ডুবতে পারে? না, অন্য কোনো বিপদে পড়লেন? দুজন কখনো বসছে, কখনো অস্থিরভাবে। পায়চারি করছে। যদি দত্তদা না ফেরেন? নৌকো ছাড়া তারা যে এই দ্বীপে বন্দী। বেরিয়ে। খোঁজখবর করারও উপায় নেই। এই দ্বীপ থেকে মুক্তির উপায় একদিন ঠিকই হবে কিন্তু দত্তদাকে ছাড়া ফিরতে হবে নাকি? এ ঘটনাটি স্বীকার করার কথা মনে এলেই বুক হিম হয়ে। যাচ্ছে তপনের। কোন্ মুখে সে বৌদির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ব্যাংককে ফিরে?

মাঝরাত। ফুটফুটে জ্যোৎস্নার আলো। ডন বলল, কী যেন একটা আসছে। মনে হচ্ছে নৌকো।

ঠিক তাই। লাফিয়ে উঠল তপন। নৌকো এসে নোঙর ফেলল তীরে। ছুটে কাছে গেল দুজনে।

নৌকো থেকে নামল পোকো, আলী আর একজন মাঝি। কিন্তু দত্তদা কই? পোকো জানাল যে, আগ্নেয় দ্বীপের ঠিক পিছনে আছে আর একটা দ্বীপ। সেই দ্বীপে যখন তারা পৌঁছয় তখন দুপুর। দ্বীপ থেকে ভেসে আসে কতকগুলো শব্দ। মনে হল কেউ কাঠ কাটছে। দত্তদা বললেন যে, উনি দ্বীপে উঠে একবার উঁকি দিয়ে আসবেন। পোকোরা নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। দুত্তদা তীরে উঠে ঢুকে যান ভিতরে।

অল্পক্ষণ বাদে হঠাৎ একটা লোক এসে দাঁড়ায় তীরে। লম্বা-চওড়া এক শ্বেতাঙ্গ। হাতে বন্দুক। সে চিৎকার করে কী জানি বলে। তারপর বন্দুক তাক করে নৌকো লক্ষ্য করে। বেগতিক বুঝে পোকো নোঙর তুলে ফেলে। লোকটা গুলি চালায় একবার। ভাগ্যিস নৌকোর কারোর গায়ে লাগেনি! তখন প্রাণভয়ে দাঁড় টেনে পালায় মাঝিরা। হা-হা অট্টহাসি দেয় লোকটা। বন্দুক তুলে বুঝিয়ে দেয়, কাছে এলেই গুলি করবে।

পোকো নৌকো নিয়ে দূরে সরে গিছল। মতলব ছিল, ঘণ্টাখানেক বাদে আবার ওখানে ফিরে দত্তদাকে তুলে নেবে। কিন্তু ঝোড়ো বাতাস উঠল। নৌকোকে টেনে নিয়ে গেল

অনেক তফাতে। যখন ফেরার সুবিধে হল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্ধকারে ওই বিপজ্জনক দ্বীপের কাছে যেতে ভরসা হয়নি তাদের। কারণ দ্বীপটার ধারে ধারে প্রচুর প্রবাল প্রাচীর। ভয়ে তাদের বুদ্ধিসুদ্ধিও কেমন গুলিয়ে গেছিল। কী করবে ভেবে না পেয়ে আপাতত নিজেদের আস্তানাতেই ফিরে এসেছে।

চল এখুনি, দত্তদাকে উদ্ধার করে আনি, তপন উত্তেজিত। ডন খানিক চুপ করে থেকে বলল, এখন নয়। এখন গেলে পৌঁছতে সকাল হয়ে যাবে। ওরা দেখে ফেলতে পারে। আমরা ডাঙায় ওঠার আগেই গুলি চালালে বিপদে পড়ব। যাব কাল রাতে। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে। প্রফেসর ঠিকই সব লক্ষ্য রেখেছেন এবং সাবধানে লুকিয়ে থাকবেন। ওটা যে আমাদের নৌকো ওরা বুঝতে পারেনি। ভেবেছে, সাধারণ জেলে-নৌকো। তাই ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চেয়েছে।

ওটাই কি ডিক্সন আইল্যান্ড? তপন জিজ্ঞেস করল।

তাই মনে হচ্ছে, নইলে চ্যাং ওখানে আড্ডা গাড়বে কেন? বলল ডন।

.

রাতে রওনা হল তপনরা।

আগ্নেয়দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে তপনদের নজরে এল ডিক্সন আইল্যান্ড। আগ্নেয়গিরির ধোঁয়ায় সেখানকার আকাশে চাঁদের আলো আড়াল হয়ে গেছে। এক হিসেবে ভালোই হল। সহজে কারো নজরে আসবে না আগুয়ান নৌকোখানি। তীর আর বড়জোর পঞ্চাশ হাত। পোকো বলল, সামনে প্রবাল প্রাচীর। আর এগনো বিপজ্জনক।

এইখানেই নেমেছিলেন দত্তদা। তখন দিনের বেলায় প্রবাল প্রাচীরের ফাঁকে ফাঁকে নৌকো তীরের কাছে গিয়েছিল। এখন রাতে কিছু বোঝার উপায় নেই।

ওই দেখ একটা আলো, দেখাল আলী।

সমুদ্রতীরে জলের ধারে একটা ছোট্ট বৃত্তাকার আলো। জ্বলছে আর নিভছে। ও আলো টর্চের। কেউ সংকেত জানাচ্ছে। নিশ্চয়ই দত্তদা।

নৌকো থেকে আলোর সংকেত দিতে ভয় হল। যদি চ্যাং-এর দলের কারও চোখে পড়ে যায়? ডন বলল, আমি.গিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছি প্রফেসরকে। আমাদের জবাব না পেলে নৌকোয় আসতে ভরসা পাচ্ছেন না উনি। এখানে ঢেউ বেশি নেই। পাথরগুলোর পাশ কাটিয়ে সাঁতরে যাব অনায়াসে।

আপনি নয়, আমি যাই, বলল জিয়ান।

কেন?

ধরুন প্রফেসর ওদের হাতে বন্দী। আর ওই আলোর সংকেত হচ্ছে ফাঁদ। চ্যাং-ই আলো দেখাচ্ছে, আমাদের কাছে টেনে এনে বেকায়দায় ফেলে আক্রমণ করার মতলবে। আপনিও বন্দী হলে সর্বনাশ। প্রফেসরকে রক্ষা করার জন্যই আপনার মুক্ত থাকা দরকার। আমি বন্দী হলেই বা ক্ষতি কী? আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। দয়া করে, ঋণটুকু শোধ করার সুযোগ দিন।

ডন একটু ভেবে বলল, বেশ তুমিই যাও। যদি সত্যি ফাঁদ হয়, একটা চিৎকার দিয়ে আমাদের সাবধান করে দিও।

সেই মিটমিটে জ্বলা-নেভা আলোর দিকে তাকিয়ে কঠোর স্বরে বলল ডন, যদি প্রফেসরের কোনো ক্ষতি করে ওরা, আমি ঠিক ওই দ্বীপে উঠব লুকিয়ে। তারপর পাগলা কুকুরের মতো গুলি করে মারব সব কটাকে।

জলে নেমে নিঃশব্দে অদৃশ্য হল জিয়ান।

নৌকোর আরোহীরা প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠ। আলোটা আর জ্বলছে না। দত্তদার দেখা পেল কি জিয়ান? না, চেঁচিয়ে ওঠার আগেই ওকে স্তব্ধ করে দিয়েছে ধূর্ত চ্যাং?

সহসা নৌকোর ধারে ভেসে ওঠে দুটি দেহ।

ডন– দত্তদার গলা।

সবাই ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়াল। নামিয়ে দেওয়া হল দড়ির সিঁড়ি।

প্রথমে উঠলে দত্তদা। তারপর জিয়ান। ডন জিয়ানের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বললেন ওয়েল ডান। থ্যাঙ্ক ইউ।

একটু জিরিয়ে নিয়ে দত্তদা বললেন, দোহাই, আগে কিছু খেতে দাও। পেট জ্বলছে।

ফ্লাক্স থেকে ঢালা গরম কফিতে চুমুক দিয়ে বিস্কুট চিবুতে চিবুতে দত্তদা বললেন তাঁর অভিজ্ঞতা।–হ্যাঁ, ওটা ডিক্সন আইল্যান্ড সন্দেহ নেই। দত্তদা প্যারাডাইস বার্ড-এর ডাক শুনেছেন। ঝোপ ও পাথরের আড়াল থেকে লক্ষ করেছেন চ্যাংদের। চ্যাং-এর দলে চার জন মাঝি। আর রয়েছে চ্যাং ও ঢ্যাঙা কিচিল। ওরা পাখি ধরছে। জালের ফাঁদ নিয়ে যেতে দেখেছেন মাঝিদের। হতভাগারা পাখি মারছেও। চ্যাংকে দেখেছেন দত্তদা, একটি মৃত প্যারাডাইস বার্ড হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে। তবে বার্ড অফ প্যারাডাইসের নতুন স্পিশিস ওরা ধরতে পেরেছে কিনা ঠিক জানেন না। বেশি কাছে যেতেও ভরসা হয়নি।

দত্তদা বললেন, কাল রাতেই ডিক্সন আইল্যান্ডে চড়াও হতে হবে। রাতদিন ওরা সমুদ্রে নজর রাখে চ্যাং আর কিচিলকে কাবু করতে পারলেই কেল্লা ফতে। শুধু ওদের দুজনেরই বন্দুক আছে। বার্ড অফ প্যারাডাইস হত্যা বেআইনি। এই অপরাধেই ওদের গ্রেফতার করা যাবে। তারপর আমরা নতুন স্পিশিসটার সন্ধান করব। সাবধান, বিষাক্ত সাপ আছে দ্বীপটায়। ভীষণ বিষাক্ত ডেথ অ্যান্ডার। আমি দেখেছি নিজের চোখে। হয়তো এই ভয়েই ও দ্বীপে কেউ যায় না।

দত্তদাকে সঙ্গে নিয়ে সবাই নৌকোয় ফেরে ডিক্সন আইল্যান্ড থেকে।

পরদিন সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

আসন্ন লড়াইয়ের সম্ভাবনায় মাঝিদের কী উৎসাহ! তাদের কথাবার্তা শুনে তপনের ধারণা হল যে, অকারণে তাদের ওপর গুলি ছোঁড়ার জন্য মাঝিরা চ্যাং ও কিচিলের ওপর বেজায় চটে আছে। তারা জিয়ানের মুখে শুনেছে, চ্যাং লোকটা পাক্কা শয়তান। দা, কুঠার, লাঠি, তির, ধনুক ইত্যাদি হাতিয়ার জোগাড় হল। একটাই বন্দুক। সেটা নেবে ডন।

.

০৮.

দুপুরে হঠাৎ গুরগুর আওয়াজ শোনা গেল, চাপা মেঘগর্জনের মতো। সবাই সমুদ্রতীরে ছুটে গিয়ে চাইল পাশের দ্বীপে আগ্নেয়গিরিটার দিকে। দেখল, সেই পাহাড়ের চুড়ো দিয়ে ধোঁয়া উঠছে আরও মোটা হয়ে। দ্বীপের মাথায় ধোঁয়ার মেঘ বিশাল হয়ে উঠেছে।

গুরগুর ধ্বনি আর থামে না। কমে, আবার বাড়ে। মাঝে মাঝে পায়ের তলার কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ডন বলল, প্রফেসর, আজ আমাদের অভিযান বন্ধ রাখতে হবে। এখন ওই ধাপের কাছে ঘেঁষা খুব বিপজ্জনক।

দত্তদা অস্থির হয়ে বললেন, কিন্তু চ্যাং যে সব পাখি শেষ করে দেবে।

ডন বলল, চ্যাং নেহাত গাধা না হলে এখনও ডিক্সন দ্বীপে বসে থাকবে না।

দত্তদা উত্তেজিতভাবে কী বলতে যাচ্ছেন, ঠিক তখনই যেন প্রলয় ঘটল। দ্বীপটা এমন কেঁপে উঠল যে সবাই টলে পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে কানফাটা আওয়াজ। আকাশ বাতাস যেন চৌচির হয়ে গেল। সবার নজরে এল, আগ্নেয়গিরির চুড়োর মুখ দিয়ে আগুনের শিখা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে আকাশ ছুঁচ্ছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী ফুঁসে উঠছে–বিপল আকারে আগুনরাঙা কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশি। সে দৃশ্য যেমনই সুন্দর, তেমনই ভয়ঙ্কর।

প্রচণ্ড ভারী কী একটা আছড়ে পড়ল শ-খানেক হাত তফাতে ঝোঁপের ওপর। সবাই দেখল ফুটবলের আকারের একখানা পাথর, জ্বলন্ত কয়লার মতো গনগনে লাল। সঙ্গে সঙ্গে ঝোঁপটা জ্বলে উঠল।

ডন চেঁচাল, পালাও পালাও। পাথর ছিটকোচ্ছে। আড়ালে চলো।

দ্বীপের অপর প্রান্তে ছোট এক গুহার মধ্যে ঢুকে আশ্রয় নিল সবাই। আরও কয়েকখানা। পাথর পড়ার শব্দ হল। মাঝে মাঝে ভীষণ জোরে জোরে ছাক ছাক আওয়াজ। জলন্ত পাথর এসে পড়ছে সমুদ্রের জলে! হাওয়া তেতে উঠেছে। রীতিমতো গরম লাগছে। ভেসে আসছে গন্ধকের বিশ্রী কটু গন্ধ। এলোমেলো ঝোড়ো বাতাস বইছে প্রবল বেগে। সাগরে উথাল-পাথাল ঢেউ।

সন্ধ্যার সময় আর একবার বিরাট বিস্ফোরণ ঘটল। থরথর করে কেঁপে উঠল তপনদেন দ্বীপ। ফের একদফা জ্বলন্ত পাথর-বৃষ্টি। জ্বলে উঠল অনেক ঝোঁপ-জঙ্গল। সেই গুরুগুরু ধ্বনি এবং মৃদু মৃদু ভূকম্পন সমানেই হচ্ছিল। উন্মত্ত সাগরের কলরোল এবং বাতাসের হু-হু শব্দে কানে তালা লাগে। ঝড়ের দাপটে গুহার বাইরে বনভূমি যেন ছিন্নভিন্ন হচ্ছে।

দত্তদা তপনের পিঠে হাত রেখে বললেন, কি, ভয় করছে?

মাথা নাড়ল তপন। বাইরে স্বীকার না করলেও তপন ভাবল, ভয়? হ্যাঁ, তা করছে। বইকি! এ কী মহাদুযোগ! বিপদের এমন ভয়াল রূপ তার কল্পনার বাইরে। এক-একটা প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যেন চমকে লাফিয়ে উঠছে তার হৃৎপিণ্ডটা। প্রকৃতির এই তাণ্ডবে নিজেকে মনে হচ্ছে কত তুচ্ছ অসহায়। ভয় ও বিপদের সঙ্গে তার কি কখনো পরিচয় হয়নি? হয়েছে বইকি! কলকাতা শহরের পথেঘাটে কত বিপদ! কত রকম দুর্ঘটনা, খুনোখুনির মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু এই বিপদের ধরন আলাদা।

শহুরে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সে হাঁপ ছেড়েছে। একটা বিভীষিকাময় স্মৃতি। ওই বিপদ ও ভয়ের স্মৃতি মুছে ফেলতে চায় মন। কিন্তু আজকের এই বিপদ থেকে যদি সে রক্ষা পায়, এর স্মৃতি তার মনে চিরকাল থাকবে। ইচ্ছে করেই সে বাঁচিয়ে রাখবে এর স্মৃতি। এই বিপদ, এই দুর্যোগের কথা সে মনে রাখবে গর্বের সঙ্গে। এ বিপদ যে সাধ করে ডেকে আনা। এর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ায় বীরত্ব। হাত-জিত দুই-ই গৌরবের।

.

রাত নামল। ছোট ছোট বিস্ফোরণ বার কয়েক হলেও সৌভাগ্যের বিষয় বড় বিস্ফোরণ আর ঘটল না। আগ্নেয়গিরির গর্জানি এবং ভূমিকম্পের বেগ ক্রমে ক্ষীণ হতে হতে থেমে গেল। সমুদ্র ও বাতাস শান্ত হয়ে এল। তবে রাতে কেউ আর বাইরে বেরোতে সাহস পেল না। বড় পাথর পড়া কমলেও ছোট ছোট জ্বলন্ত নুড়ি এসে পড়ছিল তখনো। এমনি একখানার ঘায়েই ফুটো হয়ে যেতে পারে মাথা।

দিনের আলোয় দেখা গেল আগ্নেয়দ্বীপের চুড়ো দিয়ে তখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছে, তবে সরু হয়ে। তপনদের দ্বীপের গাছপালা পাতার ওপর পুরু একগাদা ছাই জমেছে। দত্তদা ছটফট করছেন। ইচ্ছে, তখুনি ডিক্সন দ্বীপে যাবেন। ডন বারণ করল, আজকের দিনটা সবুর করুন। যদি ফের বিস্ফোরণ হয়?

তপন দত্তদাকে আটকাবার জন্য ডনকে সমর্থন জানিয়ে বলল, সত্যি, সামান্য পাখির জন্যে এরকম লাইফ-রিস্ক নেওয়া উচিত নয়।

খর চোখে তপনের দিকে চেয়ে দত্তদা বললেন, সামান্য পাখি, কী বলছ! একটা আশ্চর্য সুন্দর নতুন স্পিশিস। একজন ন্যাচারালিস্টের কাছে এমন একটা আবিষ্কারের মূল বোঝো? জানেনা এরকম কোনো আবিষ্কার তার কাছে কত বড় পুরস্কার? এমনি পুরস্কারের লোভেই ওয়ালেস, বেটস, হামবোল্ট, হার্ডসন, ডারউইন-এর মতো বিখ্যাত ন্যাচারালিস্টরা কত দুর্গম পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরেছেন। যদি কোনো নতুন পশু পাখি, গাছপালা, কীটপতঙ্গ আবিষ্কার করা যায়? এমন একটা আবিষ্কারের জন্য প্রাণ তুচ্ছ করা যায়–সে তুমি ঠিক বুঝবে না তপন, কেবল টাকাকড়ি লাভের মাপকাঠি দিয়ে এসব আবিষ্কারের মূল্য বিচার হয় না। তবে জেনে রাখো, বৈজ্ঞানিক মহলে এমনি একটা আবিষ্কারের বিরাট দাম, বিরাট, সম্মান।

কিন্তু ডন কিছুতেই দত্তদাকে তখন ডিক্সন আইল্যান্ডে যেতে দিল না। বলল, যা হবার হয়ে গিয়েছে। একটা দিন আগে গেলে কি আর বেশি লাভ হবে? হয়তো শুধু প্রাণটা খোয়াবেন। এটা স্রেফ গোঁয়ার্তুমি। না, না, আজ আপনার কিছুতেই যাওয়া হবে না।

বাধ্য হয়ে দত্তদা নিরস্ত হলেন।

.

পরদিন সকালে নৌকোয় ডিক্সন দ্বীপে চলল সবাই। তখনো আকাশ জুড়ে কালো মেঘের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে আগ্নেয়গিরির ছাই। সূর্যের আলো তাই ম্লান।

তপনদের নৌকো আগ্নেয়গিরিকে অনেকখানি পাশ কাটিয়ে গেল। ওই দ্বীপের চেহারাটা একদম পালটে গেছে। গাছপালা সব পুড়ে খাক। নেড়া পাথর বেরিয়ে পড়েছে। পাহাড়ের গা বেয়ে অনেকগুলো মোটা মোটা লাভার স্রোত নেমেছে। জ্বলন্ত গলিত লাভা অবশ্য তখন আর তরল নেই। জমাট বাঁধছে। তবে তখনো তাদের গা দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

ডিক্সন দ্বীপ দেখে দত্তদার চোখে প্রায় জল এল। ছারখার হয়ে গেছে দ্বীপ। অর্ধেক গাছপালা শেষ। কিছু ঝোঁপ তখনো জ্বলছে। কত বিশাল বিশাল গাছের ডালপালা নির্মমভাবে মুচড়ে ভেঙে গেছে। কত গাছ ঝলসে কালো হয়ে গেছে। সারা দ্বীপময় নানা প্রাণীর মৃতদেহ ছড়ানো। তবে মৃত পাখি খুব কম। বিপদের আশঙ্কায় তারা নিশ্চয়ই

বেশির ভাগই দ্বীপ ছেড়ে উড়ে পালিয়েছে। তবে বেচারা ডাঙার প্রাণীদের সে সুবিধা হয়নি।

সাবধান-হেঁচকা টানে ডনকে সরিয়ে আনল পোকো। দেখা গেল, ডনের পায়ের কাছে পাথরের আড়াল থেকে মাথা তুলছে এক ডেথ-অ্যাডার। অনেকটা চন্দ্রবোড়ার মতো দেখতে। আলী বিদ্যুৎবেগে দা-এর কোপ দিল। দুখানা হয়ে গেল সাপটা।

একটি মৃত প্যারাডাইস-বার্ড পাওয়া গেল। দগ্ধ বিকৃত দেহ। দত্তদা পরীক্ষা করে বললেন, মনে হচ্ছে কিং বার্ড অফ প্যারাডাইস। অথবা–তার কথা থমকে গেল। অর্থাৎ কিং বার্ড-এর মতন দেখতে ডিক্সন-সৃষ্ট নতুন স্পিশিসটাও হতে পারে।

সারা দ্বীপ খুঁজে চ্যাং বা তার দলের কারো চিহ্ন মিলল না।

দত্তদা উত্তেজিত হয়ে বললেন, চ্যাং পালিয়েছে। নিশ্চয়ই কিছু প্যারাডাইস বার্ড ধরে নিয়ে গেছে। চলো, এখুনি ফিরি। সোবরাং থেকে ওয়ারলেসে খবর পাঠাব চারদিকে। যদি পাচার করার আগেই ওদের পাখি সমেত ধরা যায়–

তপনদের নৌকো ভেসে চলেছিল মেসমন দ্বীপপুঞ্জের ভিতর দিয়ে, নানা দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে। ইচ্ছে, সন্ধের আগে নোঙর ফেলা হবে না। যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। দত্তদা

একবার বিষণ্ণ সুরে বললেন তপনকে, ইস্ এক সপ্তাহ আগে যদি ডিক্সন দ্বীপে পৌঁছতে পারতাম। বোকা জিয়ানটা সব ভণ্ডুল করে দিল।

বিকেলবেলা। সামনেই ছোট্ট এক দ্বীপ। দেখা গেল, দ্বীপের তীরে দাঁড়িয়ে তিন-চারজন লোক প্রাণপণে হাত নেড়ে ইশারা করছে তপনদের নৌকোর উদ্দেশে। দত্তদা চোখে দূরবীন লাগিয়ে তাদের নজর করে জিয়ানকে বললেন, দেখ তো।

জিয়ান দূরবীন দিয়ে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, আরে এ যে কিচিল! আর অন্য লোকগুলো চ্যাং-এর নৌকোর মাঝি।

চলো ওই দ্বীপে, দত্তদা হুকুম দিলেন।

তীরে নৌকো ভিড়ল। ডন বন্দুক বাগিয়ে প্রস্তুত। ধূর্ত চ্যাংকে বিশ্বাস নেই। কে সে? এরা কী করছে এখানে? ডাকছিল কেন?

কাছে গিয়ে লোকগুলোর চেহারা দেখে তপনরা থ। সবার অবস্থাই অতি করুণ। ছিন্ন-ভিন্ন পোশাক, কালিমারা মুখ, উসকো-খুসকো চুল। কিচিলের মাথায় ব্যান্ডেজ জড়ানো, তাতে রক্তের ছোপ। একটা চোখ ফুলে উঠে প্রায় বন্ধ। কিচিল কাতর স্বরে ইংরেজিতে বলল, একটু জল। প্লিজ, একটু জল দাও খেতে।

খাবার জল দেওয়া হল।

কিচিল ও তার মাঝিরা আকণ্ঠ জল পান করল।

কী ব্যাপার? চ্যাং কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন দত্তদা।

চ্যাং নেই, উত্তর দেয় কিচিল।

নেই মানে!

সমুদ্রে ডুবে গেছে।

কী করে?

থেমে থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে যা বলল কিচিল তা এই–আগ্নেয়দ্বীপে ধোঁয়ার বহর দেখে ভয় পেয়ে তারা ডিক্সন দ্বীপ ছাড়ে। মাঝিরা আগেই পালাতে চেয়েছিল কিন্তু চ্যাং শোনেনি। সে তখন প্যারাডাইস-বার্ড ধরতে মত্ত। অগ্নুৎপাত ঘটলে ডিক্সন দ্বীপ নষ্ট হয়ে যাবে, তাই তার আগেই যে কটা পাখি ধরা যায়। বিশেষত ওই নতুন জাতের প্যারাডাইস-বার্ড। সোনার ওজনেও নাকি ও-পাখির দাম হয় না। চ্যাং ভরসা দিয়েছিল যে এমনি ধোঁয়া অনেক পাহাড়েই বেরোয়, তা বলে চট করে বিস্ফোরণ ঘটে না। গতিক

সুবিধের নয় দেখে শেষে মাঝিরা বেঁকে বসলে পর সে বাধ্য হয়ে দ্বীপ ছেড়েছিল। কিন্তু সেজন্য তার কী রাগ, আর মাঝিদের কী গালাগালি!

আসলে চ্যাং-এর মতলব ছিল সবচেয়ে কাছের দ্বীপটায় আশ্রয় নেবে। কিন্তু আগ্নেয় পাহাড়কে পাশ কাটিয়েই দূরবিনে দেখে ওই দ্বীপের সমুদ্রতীরে প্রফেসর দত্তর দলবল দাঁড়িয়ে। ফলে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে তারা অন্য দিকে পাড়ি দেয়। ঘন্টা দুই সমুদ্রযাত্রার পর হঠাৎ তাদের কানে ভেসে আসে বিস্ফোরণের আওয়াজ। তার একটু বাদেই এল ঝড়। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঢেউ ওঠে। সেই দুর্যোগে মাঝিরা যখন নৌকো ও নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া তখন চ্যাং মাঝিদের হুকুম করে, পাখির খাঁচাগুলো নৌকোর খোলের গায়ে শক্ত করে বেঁধে ধরে থাকতে। যাতে সেগুলো ঠোকর না খায়। মাঝিরা তার আদেশ মানেনি। তখন চ্যাং তাদের মারতে থাকে। বন্দুক নিয়ে গুলি করার ভয় দেখায়। মাঝিরা তার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। সেই ধস্তাধস্তির সময় চ্যাং উল্টে পড়ে যায় জলে। আর তার দেখা পাওয়া যায়নি। নৌকো বেটাল হয়ে ছোটে। শেষে এই দ্বীপের গায়ে সজোরে ধাক্কা খায়। আহত হলেও বাকিরা প্রাণে বেঁচেছে। ওই যে নৌকো–

দেখা গেল চ্যাংদের নৌকোটা দুমড়ে ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দ্বীপের সমুদ্রতটে।

প্যারাডাইস বার্ড ধরতে পেরেছিলে? দত্তদা প্রশ্ন করলেন কিচিলকে।

হ্যাঁ! জবাব দিল কিচিল।

কটা? ঠিক করে বলো। দত্তদা ধমকে উঠলেন।

কিচিল ঢোঁক গিলে বলল, চারটে। আমার দোষ নেই স্যার। আমি শুধ সঙ্গে এসেছিলাম। যা করছে সব ওই চ্যাং।

নতুন জাতের প্যারাডাইস-বার্ড ধরতে পেরেছিলে? জিজ্ঞেস করলেন দত্তদা।

হ্যাঁ। মাত্র একজোড়া। বেশি পাখি ছিল না দ্বীপে। সব উড়ে পালাচ্ছিল ধোঁয়ার ভয়ে।

পাখিগুলো কোথায়?

চ্যাং জলে পড়ে যাওয়ার পর মাঝিরা খাঁচা খুলে সব পাখি উড়িয়ে দিয়েছে। এর ধারণা হয়েছিল, পাখিগুলো অপয়া। ওদের জন্যেই এই বিপদ।

পাখি মেরেছ কটা?

মাত্র একটা। জ্যান্ত ধরার চেষ্টাতেই ছিল চ্যাং। কারণ জীবন্ত পাখির দাম ঢের বেশি।

মৃত পাখিটা আছে?

না। মাঝিরা ফেলে দিয়েছে জলে।

আর কথা না বলে দত্তদা গুম হয়ে রইলেন খানিক। চ্যাং-এর মাঝিরা দত্তদার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে কাতর কণ্ঠে বলতে লাগল, দোহাই, আমাদের ফেলে রেখে যাবেন না। এখানে থাকলে আমরা মারা পড়ব। এ-দ্বীপে খাবার জল নেই।

ঠিক আছে। আশ্বাস দিলেন দত্তদা। তারপর পিছনে ফিরে হাঁটতে শুরু করলেন, তপনও তার সঙ্গে সঙ্গে চলল।

.

গভীর নিশ্বাস ফেলে দত্তদা বললেন, বুঝলে তপন, চ্যাং উচিত শাস্তিই পেয়েছে। কিন্তু ওর লোভের জন্য দুর্লভ পাখিগুলো হাতছাড়া হল, এ বড় আপশোসের।

সত্যি আপনার এত চেষ্টা ব্যর্থ হল। তপন সান্ত্বনা জানায়।

না, পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছি বলা যায় না, ম্লান হেসে বললেন দত্তদা, একটা ধূর্ত শয়তানের চক্রান্ত ব্যর্থ করেছি। পাখিগুলো তাকে অধিকার করতে দিইনি। এইটুকু যা লাভ! কাছের

দ্বীপটায় আশ্রয় নিতে পারলে ওদের উদ্দেশ্য সফল হত, আমরা গিয়ে পড়তেই তা সম্ভব হয়নি।

পড়ন্ত বেলায় অস্তরবির আলোয় মলুক্কা সাগরের নীল জল যেন সিঁদুর-গোলা। কিছু দূরে একটা দ্বীপের দিকে খানিকক্ষণ উদাসভাবে চেয়ে থেকে দত্তদা বললেন, প্রার্থনা করো তপন, ডিক্সন দ্বীপের পাখিরা যেন নিরাপদে আশ্রয় পায়। বার্ডস অফ প্যারাডাইস-এর ওই নতুন স্পিশিসটি যেন টিকে থাকে! হয়তো ভবিষ্যতে একদিন কোনো পক্ষিবিদের চোখ মেস্‌মন আইল্যান্ডস-এর কোনো দ্বীপে আবিষ্কার করবে এক নতুন ধরনের মানুক-দেওতা। সার্থক হবে জন ডিক্সনের স্বপ্ন।

তারপরই তিনি হাসিভরা উজ্জ্বল মুখে তপনের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি ব্রাদার, অ্যাডভেঞ্চার চেয়েছিলে, সাধ মিটেছে?

তপন চুপ করে থাকে। ভাবে, সাধ কি সত্যি মিটেছে? বোধ হয় না। একবার এর স্বাদ পেলে তৃষ্ণা যে বেড়ে যায়!

আপাতত ব্যাংকক। তারপর কখনো কলকাতায় ফেরা। শহরের সেই বাঁধাধরা দিন যাপন। কিন্তু মাঝে মাঝে কি সে দত্তদার মতন ছটফটিয়ে উঠবে না? বিচিত্র অজানা দেশের ডাক, অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ এলে কি সে এড়াতে পারবে? তার মন বলছে পারবে না। ঠিক সাড়া দেবে। দিতেই হবে।

ধন্যবাদ দত্তদা। ধন্যবাদ গোবিন্দ সিং। ধন্যবাদ বন্ধু গুরুর দাদা সুনীল ব্যানার্জি। তোমাদের দৌলতেই আমার অতিসাধারণ জীবনটা বদলে গেল। এমন আশ্চর্য অভিজ্ঞতার স্বাদে ভরপুর হয়ে উঠল।